উঠানগুলি বাঁধান ও সুপরিষ্কৃত, তথাপি সেই উঠানে প্রতিদিন প্রাতে গোময় ছড়া দিয়া থাকেন; অধিক কি পুরুষগণ শয়ন-গৃহে আসিলে গঙ্গাজল ছড়া দিয়া শুদ্ধ করিয়া লইয়া থাকেন।

কি আশ্চর্য্য কালের মহিমা! অন্তঃপুরে নারীমহলে এই শাসন, বাহির বাড়ীতে পুরুষ-মহলে যথেচ্ছাচার! নব্যশিক্ষিত পুরুষদিগের অনেকে বাহির বাড়ীতে অনেক অশাস্ত্রীয় ও অবৈষ্ণব আচরণ করিয়া থাকেন, যাহা কর্ত্তার শ্রুতিগোচর হয় না এবং যাহা মহিলারা জানিয়াও জানেন না; তাঁহারা মোটামুটি একটা কথা ধরিয়া রাখিয়াছেন, "কাল-মাহাত্ম্য" এটা সহিতেই হইবে। ঐ শয়ন-গৃহে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়া শুদ্ধ করিয়া লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। কালীপদ রায়ের মত নব্যতন্ত্রের অতিথিগণ বাহির বাড়ীতে কখনও কখনও আসিয়া থাকেন, সেখানে তাঁহাদের পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত হয়, অন্তঃপুরকে তাহা স্পর্শ করে না।

এরূপ ভবনে রায়-পরিবারের মহিলাদ্বয়ের নিমন্ত্রণ। তাঁহারা মণিবাবুর অশীতিপর বয়স্কা বৃদ্ধা জননীর চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া মণিবাবুর শয়ন-গৃহে গিয়া বসিলেন। সেখানে রায়-গৃহিণী ও বাঁড়ুয্যে-গৃহিণীতে প্রেমালাপ, বহুদিনের সুখ দুঃখের কথা, দীর্ঘনিঃশ্বাস, অশ্রুপাত প্রভৃতি হইল।

আহারের সময় বিনোদ বেচারার বড় ইচ্ছা হইল যে, মেজ জেঠাই ও বড়দীর সঙ্গে আহার করে, কিন্তু সে বেচারা বাড়ীর ভিতর আসিতে পাইল না; সে মণিবাবু, গোবিন প্রভৃতির সঙ্গে বাহির বাড়ীতে আহার করিল। মাতা ও কন্যাতে বাড়ীর ভিতরের একটী ঘরে দুজনে একা একা আহার করিলেন।

আহারান্তে মহিলারা পুনরায় বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের শয়ন-ঘরে সমাসীন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মণিবাবু অন্তঃপুরে আসিয়া মহিলাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমরা নয়ন-তারাকে এখানে দেখে কিছু বুঝ্‌তে পারবে না, ওকে চুঁচড়ার বাড়ীতে না দেখ্‌লে বোঝা যায় না; প্রকাণ্ড সংসারটা কি রকমে চালাচ্ছে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার এই মেয়ের শক্তি কত কেবল তা নয়, লিখ্‌তে পড়তে, গাইতে বাজাতে সকল দিকেই পরিপক্ক। ওর গান বাজনা একটু শুন্‌বে?"

মহিলারা সকলেই বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ হাঁ তা শুন্‌তে হবে বৈকি?"

মণিলাল। (নিকটস্থ একটী বালকের প্রতি) গোবিনের শেতারটা ও বেহালাখানা চেয়ে আন্ ত।

নয়ন-তারা। জেঠা মশাই, আজ থাক্।

মণিলাল। না না, দোষ কি, আমরা ত তোমার পর নই, আমাদের কাছে গাইতে বাজাতে দোষ কি?

নয়ন-তারা। না জেঠা মশাই আজ থাক্।

তাঁহার আপত্তির প্রতি কেহ কর্ণপাত করিলেন না। মণিলালবাবু পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে জননী বলিলেন,—"তবে একটু বাজা, সকলে এত জেদ করে ধরেছেন।"

জননীর আদেশে নয়ন-তারা শেতারটী কোলে লইলেন। সুরটা বাঁধিয়া লইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই সুন্দর স্বরলহরী উত্থিত করিলেন। সকলে চারিদিকে চিত্রার্পিতের ন্যায়। শেতার ও বেহালা চাহিতে গেলে, গোবিন কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার সহিত উক্ত যন্ত্রদ্বয় দিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচয় পরে দিতেছি, দিলেই সকল জানিতে পারিবেন, তিনি সঙ্গীত-বিদ্যাতে কিরূপ পরিপক্ক ব্যক্তি ও যন্ত্রগুলি তাঁহার কিরূপ প্রিয়। সেই যন্ত্রগুলি মেয়ে মানুষের হাতে পড়িবে এটা গোবিনের প্রাণে সহে না। মেয়ে মানুষ গান বাজনার কি জানে? গোবিন মেয়ে মানুষের গান বাজনা অনেক দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাকে বিদ্যা বলে না, কেবল ভেঙ্গচান মাত্র। গোবিন চিরদিন যে সকল স্ত্রীলোকের সহিত মিশিয়াছেন, তাহাদিগকে দেখিয়া স্ত্রীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধাই বাড়িয়াছে; সুতরাং স্ত্রীলোকে বাজাইবে যখন শুনিলেন, তখন একটু হাসিয়া যন্ত্র দুটী দিলেন।

কিন্তু নয়ন-তারা যখন স্বর-লহরী তুলিতে লাগিলেন, তখন গোবিন আর বাহির বাড়ীতে থাকা কঠিন বোধ করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, —"তাই ত এ যে দেখি পাকা হাত।" আস্তে আস্তে অন্তঃপুরে আসিয়া যে ঘরে মহিলাগণ সমাসীন ছিলেন, তাহার জানালার অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন।

শেতারে দুই একটী গৎ বাজাইয়া নয়ন-তারা শেতারটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এ শেতারটী কার?"

মণিলাল। ওটা আমার ছোট ভাই গোবিনের।

নয়ন-তারা। বেশ শেতারটী, আমার ওস্তাদ দেখ্‌লে বড় খুসী হন।

মণিলাল। আমাদের গোবিন একজন পাকা বাজিয়ে, সে তোমার বাজনা শুন্‌লে খুব খুসী হত।

অমনি একজন মহিলা বলিয়া উঠিলেন—"ঐ যে গোবিন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে শুন্‌চে।

মণিলাল। এসনা গোবিন, ভিতরে এস।

মণিলাল বাবুর পূর্ব্বে ইচ্ছা ছিল না যে গোবিনের সহিত মহিলাদ্বয়ের বিশেষ পরিচয় করিয়া দেন; কারণ তিনি গোবিনের প্রতি প্রসন্ন নহেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন।

গোবিন সলজ্জ ভাবে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া মহিলাদ্বয়কে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন।

মণিলাল। গোবিন তুমি একবার বাজিয়ে শুনাও ত।

গোবিন তাহাতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু মহিলাদিগের আগ্রহে ও গুরুজনের আদেশে শেতারটী তুলিয়া লইলেন। তিনি একটী গৎ ধরিবামাত্র নয়ন-তারার নেত্রদ্বয় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি আচ্ছন্ন হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শেতার থামিলে নয়ন-তারা বলিলেন,—"উনি ত একজন ওস্তাদ।" পরে উভয়ের সঙ্গীত-বিদ্যা বিষয়ে দুই চারিটী কথা হইল। নয়ন-তারা গোবিন কোন ওস্তাদের কাছে শিখিয়াছেন, কতদিন শিখিয়াছেন প্রভৃতি অনেক প্রশ্ন করিলেন।

মণিলাল বাবু পুনরায় নয়ন-তারাকে একটী ব্রহ্ম-সঙ্গীত করিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। নয়ন-তারা কিছুতেই সম্মত নহেন। একে যেখানে সেখানে যেমন তেমন অবস্থাতে ভক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত করিতে ইচ্ছা করেন না, তাহাতে আবার গোবিনের মত পাকা গাইয়ে ও বাজিয়ে লোকের কাছে বেহালা ধরিতে সাহস হয় না। অনেকক্ষণ পীড়াপীড়ির পর, নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে বেহালা-খানি তুলিয়া লইলেন ও অনেকক্ষণ চিত্ত স্থির করিয়া ভক্তিভাবে হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া একটী সঙ্গীত ধরিলেন। ভক্তি-সঙ্গীতের প্রাণ ভক্তি; সেই একই সঙ্গীত দুই জনে গাক, দুই প্রকার শুনায়; কাহারও মুখে অমৃত বর্ষণ করে, কাহারও মুখে থেংরা মারে। সঙ্গীতে যদি গায়ক আপনাকে দেয়,

আপনি ডুবিয়া যায়, তবেই তাহা বিচিত্র শুনায়। অদ্যকার মজলিসে তাহাই হইল। ভক্তিসঙ্গীত গাইতে গিয়া নয়ন-তারার নয়নে ভক্তি-অশ্রু গড়াইতে লাগিল। তাহাতে সেই বিনয়াবনত ও হ্রীসমন্বিত মুখখানি কি অপূর্ব্ব শ্রীই ধারণ করিল! সেই অশ্রুধারা দর্শনে আরও অনেক চক্ষু সিক্ত হইয়া গেল। গোবিনের প্রাণে এক নূতন তরঙ্গ তুলিয়া দিল।

গোবিনের একটু পরিচয় এখানে আবশ্যক। গোবিনের বয়স এখন ৩০।৩২শের অধিক হইবে না। বর্ণটী উজ্জল শ্যাম; গৌর বলিলেই হয়; চক্ষু দুটী বিশাল ও উজ্জল; যেন কৌতুকে ভাসিতেছে! মস্তকে ঘন নীল কেশরাজি, পোমেটম, সুগন্ধি, ও ব্রুস, কঙ্কতাদি সহকারে আলবার্ট ফ্যাসনের টেরীতে বিভক্ত হইয়া দুই পার্শ্বে ঢেউ খেলাইয়া পড়িয়াছে; মস্তকের সম্মুখ অপেক্ষা পশ্চাতের চুল খাট করিয়া কাটা; সভ্য ভব্য মানুষটী; পরিষ্কার কপ-বিশিষ্ট সার্টের উপরে একটী সুভব্য কোট; ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতিপরা; আধা লাল, আধা কাল, চিনের বাড়ীর শ্লিপার পায়ে, তদুপরে এক যোড়া দামী ও প্রথম শ্রেণীর হাফ মোজা।

এখন গোবিন হাইকোর্টের একজন এটর্নি। লোকে বলে মাসে প্রায় দুই হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। কিন্তু পঠদ্দশাতে গোবিনের বড়ই অখ্যাতি ছিল। গান বাজনার বাতিকটা বাল্যকাল হইতেই আছে। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ম্মোপলক্ষে দূরে দূরে থাকাতে গোবিনের দেখিবার কেহই ছিল না; সুতরাং গোবিন কেবল ইয়ারের দলে গান বাজনা করিয়া বেড়াইত। বাড়ীর লোকে দেখিত ১০টার সময়ে পুস্তকগুলি লইয়া বিদ্যালয়ে যাইত; কিন্তু গোবিন ক্লাসে বৈগুলি রাখিয়া দ্বারবানকে দুই চারিটা পয়সা দিয়া, সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে থাকিত। কোনও ইয়ারের বাড়ীতে বা নিকটস্থ কোনও অভদ্র স্থানে সমস্ত দিন তাস পিটিয়া, চুরট ফুঁকিয়া ও গাইয়া বাজাইয়া কাটাইত। আবার যথাসময়ে পুস্তকগুলি লইয়া গৃহে আসিত। এইরূপ অনেক দিন করিত। ক্রমে যখন এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল, তখন গোবিন এক কৌশল খেলিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইল। গোবিন মাতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান; সুতরাং ইচ্ছা করিলেই টাকা পাইত। সে পরীক্ষা-[illegible]লের সন্নিকটে একটী ঘর ভাড়া করিল; সেখানে একজন বিএ পাশকরা

ছেলেকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিল; তাহার সঙ্গে কথা রহিল, যে গোবিন পরীক্ষার হল হইতে চাকরের হাতে পরীক্ষার প্রশ্ন পাঠাইয়া দিবে, সে যুবকটী ঐ ঘরে বসিয়া তাহার উত্তর লিখিবে; তৎপরে পরীক্ষা হলের দপ্তরীদিগের সাদা কাগজের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ লিখিত উত্তরের কাগজ গোবিনের নিকট আসিবে। দপ্তরীদিগকে ঘুষ দিয়া এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এইরূপে গোবিন পরীক্ষা দিয়াছিল। পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল, তখন শিক্ষক, বালক, পাড়ার লোক, ঘরের লোক সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল, গোবিন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে! শুনিতে পাওয়া যায়, এই সব কারণেই নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থীদিগকে বাঁধা খাতা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত করা হইয়াছে। প্রবঞ্চনা কয় বার চলে? এল,এ, পরীক্ষাতে আর গোবিনের উদ্দেশ পাওয়া গেল না। তাহার পাঠও সেইবারে সাঙ্গ হইল।

একদিকে যার খোলে না, অনেক সময়ে আর একদিকে তার খুলিয়া থাকে। গোবিন কলেজ ছাড়িয়া উকীলের বাড়ীতে ক্লার্ক হইল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে এটর্নির পরীক্ষায় উৎকৃষ্টরূপে উত্তীর্ণ হইয়া এটর্নি হইল। যেই এটর্নি হওয়া অমনি পশার জমিতে আরম্ভ। যেন এই কাজের জন্যই ঐ মানুষটার সৃষ্টি হইয়াছে। কতিপয় বৎসরের মধ্যে গোবিনের মাসিক আয় প্রায় দুই হাজার দাঁড়াইয়াছে। দেশীয় রঙ্গভূমিগুলির অভিনেতা ও অভিনেত্রী মহলে গোবিনের খুব পশার। গোবিন তাহাদের ব্যাণ্ডমাষ্টার না হইয়াও ব্যাণ্ডমাষ্টারের কাজ করিয়া থাকেন। প্রায় সকল রিহার্সালে উপস্থিত থাকিয়া গান বাজনার ভ্রমসংশোধন করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন বাবুদের বৈঠকে, বাগানের আমোদে, সর্ব্বত্রই গান বাজনার আসরে গোবিন না হইলে চলে না। এইরূপে সহরে যত অসচ্চরিত্র পুরুষ ও রমণী আছে, তাহাদের অধিকাংশের সহিত গোবিনের আলাপ পরিচয় ও অনেকের সঙ্গে মাখামাখি। অথচ, বিনয়, সৌজন্য, ভদ্রতাতে গোবিনের সমকক্ষ লোক মেলা ভার। তিনি মাতালের দলে সর্ব্বদা ঘোরেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে অভদ্ররূপে মাতলামি করিতে অথবা ব্রীড়াজনক কোনও প্রকার গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইতে কখনও দেখে নাই। তাঁহার অনেক সদ্‌গুণও আছে; তিনি আত্মীয় স্বজনের প্রতি প্রীতিমান, গুণানুরাগী, পরোপকারী ও সাহিত্যানুরাগী;

ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে সুপরিপক্ক। দুই বৎসর হইল, গোবিন বিপত্নীক হইয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে যেরূপ প্রলোভন তাহাতে তাঁহার ঘোর যথেচ্ছাচারে নিমগ্ন হইবার কথা। কিন্তু কি কারণে জানি না তদবধি সন্ধ্যার পর বড় একটা বাড়ীর বাহির হন না, যে দুই একজন বন্ধু বাড়ীতে আসেন, তাঁহাদিগকে লইয়া পড়াশুনা, গান বাজনাতে সময়টা যাপন করিয়া থাকেন। তৎপরে তাঁহার পশার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজ বৃদ্ধিও হইতেছে, সেজন্যও অনেক সময় ব্যস্ত থাকিতে হয়।

যাহা হউক আজ গোবিনের মনে একটা ধাক্কা লাগিল। তিনি অনেক স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন বটে, কিন্তু যে শ্রেণীর স্ত্রীলোক আজ দেখিলেন এ শ্রেণীর রমণী জীবনে কখনও দেখেন নাই। স্বাভাবিক হ্রীশীলতার পশ্চাতে এমন রূপ, এমন সৌজন্য, এমন বুদ্ধি বিদ্যা ও এমন কোমলতা কখনও দেখেন নাই। নয়ন-তারা জননীর সহিত চলিয়া গেলেন, গোবিনের বোধ হইল যেন আর কোন দেশ হইতে কি একটী স্বর্গীয় বিহঙ্গ আসিয়া, একবার ডাকিয়া উড়িয়া গেল! মনটা যেন সেই পক্ষীর উদ্দেশে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল!

এদিকে নয়ন-তারা চুঁচড়াতে আসিয়া হরেন্দ্রের নিকট তাঁহাদের কলিকাতা যাত্রার সমুদায় বিবরণ বর্ণন করিলেন ও গোবিনের চেহারা, রীতি নীতি ও সঙ্গীত বিদ্যার অনেক প্রশংসা করিলেন।

হরেন্দ্র পঠদ্দশাতে ঐ বাঁড়ুয্যে পাড়াতে থাকিতেন। তিনি গোবিনকে বিশেষরূপে জানেন। প্রতিদিন তাহার কীর্ত্তি কর্ণগোচর হইত। গোবিন কিরূপে এণ্ট্রান্সে পাশ হইয়াছিল, সে কিরূপ লোকের সঙ্গে মিশিত ও তাহার স্বভাব চরিত্র কিরূপ, কিছুই তাঁহার অবিদিত নাই। তাঁহার সমবয়স্ক বালকগণ গোবিনকে ও গোবিনের দলের বালকদিগকে ভয়ে দূরে দূরে পরিহার করিত। সুতরাং মণিলালবাবুর বাড়ীতে গিয়া যে নয়ন-তারার গোবিনের সহিত আলাপ হইল, এটা তাঁহার ভাল লাগিল না। তৎপরে তাঁহার মুখে গোবিনের প্রশংসা শুনিয়া আরও অপ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন, "এ সকল লোকের এরূপ ভদ্র মহিলাদের সঙ্গে কথা কহিবার অধিকার থাকা উচিত নয়।" একবার মনে করিলেন যে, গোবিনের

স্বভাব চরিত্রের বিষয় কিছু জানাইয়া দিবেন; আবার ভাবিলেন, সেটা ছোট কাজ, হয়ত নয়ন-তারা সেটাকে পরনিন্দা মনে করিবেন, পছন্দ করিবেন না। "দূর হোক্, একদিনের দেখা বৈত নয়। যাক্ আর কিছু বলব না।" কেবল মাত্র বলিলেন, "আমি গোবিনবাবুকে বেশ জানি, আমি সে পাড়ায় অনেক দিন ছিলাম।" মনে করিয়াছিলেন এইমাত্র বলিলেই নয়ন-তারা তাঁহার বিষয়ে আরও জানিতে চাহিবেন, তখন তাহার স্বভাব চরিত্রটা বলিয়া দেওয়ার সুবিধা হইবে। কিন্তু নয়ন-তারা আর কিছু জানিতে চাহিলেন না। হরেন্দ্রের মনের ভাবটা এইখানেই নিরস্ত হইল।

কিন্তু একদিন পরেই নয়ন-তারার নামে গোবিনের এক চিঠি আসিল। গোবিনের চিঠির মর্ম্ম এই,—"সঙ্গীত বিদ্যা বিষয়ে আপনার সহিত সেদিন কথা হইয়াছিল। তৎপরে সে বিষয়ে ভাবিয়াছি, আরও কোন কোন বিষয়ে কথা কহিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আপনাদের চুঁচড়ার বাড়ীতে গেলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে কিনা এবং যদি হয় কোন্ সময়ে হইবে?" নয়ন-তারা পিতার সম্মতিক্রমে উত্তর দিলেন,—"আপনাদের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহাতে আপনি আমাদের বাড়ীকে নিজের বাড়ী মনে করিতে পারেন এবং আপনি যখন ইচ্ছা আসিবেন।"

হরেন্দ্র এই চিঠির কথা যখন শুনিলেন, তখন ভাবিলেন, "এযে দেখি পরিচয়টা পাকাপাকিতে দাঁড়ায়। নয়ন-তারা গোবিনের স্বভাব চরিত্র না জানিতে পারেন, কিন্তু রায় মহাশয় কি জানেন না? তিনি কোন্ হিসাবে এতটা আত্মীয়তা করিতে দিতেছেন? ইঁহাদের উদারতাটা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় যায়।" এই সকল চিন্তা করিয়া একবার মনে করিলেন, গোবিনের স্বভাব চরিত্রের কথাটা নয়ন-তারাকে বলিয়া দিবেন। কিন্তু আবার কেমন বাঁধ বাঁধ করিল,—একজন মানুষের অসাক্ষাতে তাহার বিরুদ্ধে বলিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ তাহাকে যখন আসিতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তখন নয়ন-তারার নিকটে তাহার নিন্দাবাদ করিলে, তাহার আতিথ্যটার পক্ষে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইতে পারে। "দূর হোক্ গোবিন এসে চলে গেলে বলব। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করব।" এই স্থির করিয়া মনের ভাব মনেই গোপন রাখিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরের শনিবার অপরাহ্ণে নয়ন-তারা গোবিনের এক পত্র পাইলেন; তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, যে সেই সায়ংকালে তিনি আসিবেন ও তৎপর দিন থাকিবেন। পত্র পাইয়াই তিনি গোবিনের আতিথ্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। একবার দেখিয়া ও বাড়ীর লোকের মুখে শুনিয়া, তিনি গোবিনের রুচি, প্রবৃত্তি রীতি নীতি সম্বন্ধে যে ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নীচে গিয়া একটী ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া, ঘরটী সাজাইতে লাগিলেন।

এদিকে হরেন্দ্র নয়ন-তারার উদ্দেশে টুনী ও পটলাকে পড়াইবার অনেক পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। আজ বেচারার মনটা বড়ই খারাপ আছে। দেশ হইতে মাতাঠাকুরাণী পত্র লিখিয়াছেন, যে তাঁহাদের বসতবাটী বিক্রয় হইয়া যায়। তাঁহার পিতা নিজের একজন আত্মীয় বন্ধুর নিকট বাড়ীটী বাঁধা রাখিয়া দেড় হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। সেই দেড় হাজার টাকা সুদে আসলে আড়াই হাজারে দাঁড়াইয়াছে। বাবুটী এতকাল চুপ করিয়াছিলেন, হরেন্দ্রের কর্ম্ম হওয়া অবধি বার বার ত্বরা দিতেছেন। হরেন্দ্রের সামান্য বেতনে যতদূর শোধ হইতে পারে তাহা হইতেছে। বাবুটী তাহাতেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছেন না। এবারে বাড়ীটী বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প জানাইয়াছেন। হরেন্দ্রের প্রকৃতিটা এইরূপ যে, হৃদয়ে কোনও একটা আঘাত লাগিলে, প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট হয়; গভীররূপে সে ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন; যদিও কিয়ৎকাল পরেই কোথা হইতে একটা শক্তি আসে, যাহাতে সে দুঃখটা সহিয়া যায়; তখন তিনি বজ্রের মত কঠিন হইয়া পড়েন; কিছুতেই বিচলিত হন না। এই সংবাদে হরেন্দ্রের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, তাই তিনি ছুটিয়া নয়ন-তারার নিকটে আসিয়াছেন। তিনি সব কথা যে তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া বলেন তাহা নহে, বিশেষতঃ নিজের দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়ে কিছুই জানান না।

নয়ন-তারাও সে সকল বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করেন না। তবে তাঁহার সেই হাসি হাসি মুখখানি, সেই প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টিটী, সেই সরল পবিত্র ভাবটী দেখিলেই হরেন্দ্রের দুঃখের ভার লঘু হইয়া যায়। সেই প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মনকে সুধারসে সিক্ত করে।

আজ হরেন্দ্র আসিয়া নয়ন-তারাকে তাঁহার পড়িবার ঘরে পাইলেন না। চাকরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের দিদিমণি কোথায় ?" চাকরাণী বলিল, "কল্‌কেতা হতে কে বাবু আস্‌বেন, তাঁর জন্যে ঘর সাজাচ্ছেন।" হরেন্দ্রের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের পক্ষে আর একটু ভার বাড়িল। মনে মনে বলিলেন, "এই ত গোবিন এল দেখ্‌ছি! এ ভূত সহজে ছাড়লে হয়।" তদনন্তর গঙ্গাধারের জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া শূন্য শূন্য দৃষ্টে গঙ্গার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; তৎপরে বসিয়া এ কাগজটা সে কাগজটা নাড়িতে লাগিলেন। কিছুই ভাল লাগে না।

কাগজপত্র নাড়িতে নাড়িতে টেবলের উপরে একখানা অভিজ্ঞান-শকুন্তলং পাইলেন। বহুদিনের প্রিয় বৈখানা পাইয়া বোধ হইল যেন কোনও বহুদিনের পরিচিত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল! বৈখানা তুলিয়া লইয়া খুলিবামাত্র নিম্নলিখিত কবিতাটীর উপরে চক্ষু পড়িল। তিনি কবিতাটী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া,
অন্তর্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ,
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়া-বিশ্লেষ-দুঃখৈর্নবৈঃ।

কণ্ব ঋষি বলিতেছেন—"আজ শকুন্তলা যাবে বলিয়া আমার হৃদয়ে উৎকণ্ঠার সঞ্চার হইয়াছে; কথা বলিতে গেলে বাষ্পোদয় হইয়া কণ্ঠ অবরোধ করিতেছে; চিন্তাদ্বারা দৃষ্টি জড়ীভূত হইতেছে; আমি বনবাসী সন্ন্যাসী, আমারই যদি স্নেহের জন্য এত বৈক্লব্য ঘটিল, তবে না জানি গৃহী লোকে তনয়া-বিচ্ছেদ ক্লেশ কিরূপে বহন করে।"

কবিতাটী পড়িয়া হরেন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—অরণ্যবাসী জরাজীর্ণ ঋষির অন্তরে একটী প্রতিপালিতা বালিকার জন্য এতটা স্নেহ দিয়া,

কবি কি চাতুরীই খেলিয়াছেন! মানব-প্রকৃতিকে কি সুন্দর রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন! ঋষি যখন ঐ বালিকাটী কুড়াইয়া আনেন, তখন কি ভাবিয়াছিলেন ঐ কমনীয় মূর্ত্তি তাঁহার তপঃশুষ্ক অন্তরকে এতদূর আবর্জ্জিত করিবে? বোধ হয় তিনি এত দিন বুঝিতেই পারেন নাই, যে ভিতরে ভিতরে তাঁহার প্রাণটা শকুন্তলার সহিত এতটা বাঁধা পড়িয়াছে। জরাজীর্ণ অন্তরে এই স্নেহ যেন পাষাণপৃষ্ঠে গিরি নির্ঝরিণীর স্থায়, নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ ও চক্ষের প্রীতিপ্রদ। চাতুরী সহকারে কবি কোমল নারী-হৃদয়ের কি শক্তিই প্রকাশ করিয়াছেন! পুরুষের মন যতই কঠোর ও বৈরাগ্যরসে তিক্ত হউক না কেন, নারীর কোমলাঙ্গুলি সেই হৃদয়তন্ত্রীকে স্পর্শ করিলেই সেখানে সুস্বর উত্থিত হয়। নতুবা ঐ জরাজীর্ণ বৃদ্ধের প্রাণ এই বালিকার সহিত এত আবদ্ধ কেন? তৎপরে কবি আমাদিগকে কি মনোরম দৃশ্যরাজির মধ্যেই উপস্থিত করিতেছেন! শকুন্তলার তরুলতার নিকট বিদায় লওয়া, সখীদিগের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করা, মৃগশিশুটীর অনুগমন, এসব কি সুন্দর! কি সুন্দর! যেন নির্জ্জন বনে বনফুলের গন্ধ পাইতেছি! ঠিক! ঠিক! এদেশে যে একটা কথা চলিত আছে, তাহা ঠিক।

কালিদাসস্থ সর্ব্বস্বমভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।
তত্রাপিচ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা॥

অর্থ—কালিদাসের সর্ব্বস্ব অভিজ্ঞান-শকুন্তল, তন্মধ্যে আবার চতুর্থ অঙ্ক যেখানে শকুন্তলা (পতিগৃহে) যাইতেছেন।

এইরূপে কাব্যরসে মগ্ন হইয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য নিজের দুঃখ ও নয়ন-তারার অনুপস্থিতি-ক্লেশ উভয়ই ভুলিয়া গেলেন; কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলেন না। নিমগ্ন-চিত্তে কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে পুস্তকখানি রাখিয়া বলিলেন—"কৈ তিনি ত এলেন না?" তখন পটলা ও টুনীকে পড়াইতে গেলেন।

হরেন্দ্র চলিয়া গেলেই নয়ন-তারা নিজগৃহে আসিলেন। আসিয়াই শুনিলেন হরেন্দ্র তাঁহার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন সে দিন হরেন্দ্র তাঁহাকে চান, কারণ অপরাপর দিন তাঁহাকে ঘরে না পাইলে, তিনি নন্দরাণী বা সৌদামিনীকে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে

কথোপকথনে কালযাপন করিয়া থাকেন। মনে ভাবিলেন "পড়ান হলেই দেখা হবে।"

কিন্তু হরেন্দ্রের পড়ান শেষ হইতে না হইতেই গোবিন আসিয়া উপস্থিত। অন্য সময় হইলে রায় মহাশয় স্বয়ং আসিয়া বন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেন; কিন্তু আজ তাঁহার শরীরটা অসুস্থ আছে; সুতরাং সে ভার সুরেশচন্দ্র ও নয়ন-তারার উপরে দিয়াছেন। তাঁহারা ভ্রাতা ভগিনীতে গোবিনের অভ্যর্থনাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। গোবিন গাড়ি হইতে নামিয়াই শুনিলেন রায় মহাশয় পীড়িত; শুনিয়া বলিলেন—"তাঁর সঙ্গে আগে দেখা করে আসি।" নয়ন-তারা তাঁহাকে পিতার গৃহে লইয়া গেলেন।

এদিকে হরেন্দ্র পড়াইয়া উঠিয়া দেখিলেন, নয়ন-তারা গোবিনের অভ্যর্থনাতে ব্যস্ত; সুতরাং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন।

গোবিনকে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে পৌঁছিয়া দিয়াই নয়ন-তারা হরেন্দ্রের উদ্দেশে টুনী পটলার পড়িবার ঘরের দিকে ছুটিলেন। গিয়াই শুনিলেন তিনি আবার একটু অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন মনটা খারাপ হইয়া গেল। ভাবিলেন তাঁর মন নিশ্চয় খারাপ আছে, তা না হলে আমার সঙ্গে বার বার দেখা করবার চেষ্টা করবেন কেন? আহা, দু দু বার অপেক্ষা করলেন দেখাটা হলো না। এখন আমার জন্য চিঠী লিখি।" আবার ভাবিলেন— "চিঠী লেখা বৃথা, রাত্রে আসবেন না। দূর হোক কালই দেখা হবে।"

সন্ধ্যার পরে আহারের পূর্ব্বে রায় মহাশয়, গৃহিণী ও নয়ন-তারা ভিন্ন অপর সকলেই যথারীতি বৈঠক ঘরে গিয়া বসিলেন। সেখানে সৌদামিনীর সহিত গোবিনের পরিচয় হইল। গোবিন দেখিলেন যে দুটী বড় বড় চোক দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া তিনি চুঁচড়াতে আসিয়াছেন, তদ্ব্যতীত এ বাড়ীতে আরও দুইটী বড় বড় চোক আছে। কেবল তাহা নহে, সৌদামিনীর চোকের কোণে এমন একটু দুষ্টামি আছে, এমন একটু কৌতুক-প্রিয়তা আছে, যাহার আকর্ষণ গোবিন প্রকৃতির পুরুষদিগের পক্ষে অনিবার্য্য। দুই ভগিনীতে বেশ প্রভেদ! সৌদামিনীর রূপে প্রভা বেশি, নয়ন-তারার রূপে স্নিগ্ধতা বেশি; নয়ন-তারার প্রকৃতিটা গভীর ও অন্তর্মুখীন, দেখিলে আকৃষ্ট হইতে হয়, কিন্তু যেন ধরিতে পারা যায় না; হাত বাড়াইতে সাহস হয় না; যেন কি একটা

মণ্ডলে তাঁহাকে ঘেরিয়া থাকে, যাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। সৌদামিনীর প্রকৃতিটা তাহার বিপরীত; উন্মুক্ত, অনাবৃত, বহির্মুখীন, যেন বলিতেছে 'কে বন্ধু হবে এস।' নয়ন-তারার পশ্চাতে থাকাতেই লোকের চক্ষু এতদিন তাঁহার উপরে ততটা পড়ে নাই। আজ সেই রূপ দেখিবার একজন লোক উপস্থিত। আহারের পূর্ব্বে দুইজনে অনেক্ষণ কথোপকথন হইল। গোবিনের রীতি নীতি, পোষাক পরিচ্ছদ, কথাবার্ত্তা, সকলি সৌদামিনীর চক্ষে নিখুঁত লাগিল। সেই উজ্জল শ্যাম কান্তি, সুঠাম ও সুগঠন দেহ, বিশাল উজ্জল নেত্রদ্বয়, সুবাসিত সুবিভক্ত কেশরাজি, সর্ব্বোপরি সৌজন্যপূর্ণ ভাব ও দৃষ্টি সৌদামিনীর চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া দিল। গোবিনের পক্ষেও সৌদামিনীর প্রভাযুক্ত রূপ প্রমুক্ত ও কৌতুকপূর্ণ ভাবটী অতিশয় স্পৃহণীয় বোধ হইতে লাগিল।

আহারের সময়েও উভয়ে পাশাপাশি বসিলেন ও অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। তৎপরে আবার সকলে বৈঠক ঘরে আসিয়া বসিলেন। আজ নয়ন-তারা অনুপস্থিত, তিনি জননীর শয়ন-মন্দিরে পিতার পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত আছেন; সুতরাং নবাগত অতিথির পরিচর্য্যার ভার সৌদামিনীর উপরেই পড়িয়া গিয়াছে। অন্যান্য দিন তিনি এরূপ অপ্রীতিকর কার্য্য হইতে অবসৃত হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু আজ সে ভাব আসিতেছে না। আজ এই অতিথির সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ তিনি পিয়ানোতে বসিলেন, শেতার শুনাইলেন, গান করিলেন, ছবি প্রভৃতি দেখাইলেন; যাহা কিছু করিলেন তাহাতে গোবিনের মন অধিকতররূপে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। অবশেষে গোবিন যখন শেতার ধরিলেন তখন সৌদামিনীর মন একেবারে সুধারসে ডুবিয়া গেল। তিনি অস্পন্দ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শেতার থামিলে গোবিন জিজ্ঞাসা করিলেন শেষের বাজনাটা কেমন লাগল। তখন সৌদামিনীর যেন কথা কহিবার সাধ্য নাই। তিনি কি বলিলেন ভাল বুঝিতে পারা গেল না।

আজ সৌদামিনী আরও এমন কিছু অনুভব করিতেছেন যাহা জীবনে অনুভব করেন নাই। অন্য সময়ে তিনি ভগিনীর অন্তরালে থাকিয়া দুষ্টামি করিবার অবসর পান, সকলেই তাঁহাকে বালিকা ভাবে দেখে, তিনিও আপনাকে বালিকার অতিরিক্ত আর কিছু মনে করেন না; এবং বালিকাসুলভ চপলতা প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন না; কিন্তু আজ বৈঠকের আসরে গোবিনের সহিত

চক্ষে চক্ষে মিলন হইয়া হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য তাঁহার নারীত্ব যেন একবার ফুটিয়া উঠিল। এটা এত আকস্মিক, এত নূতন, এত অপ্রত্যাশিত যে হৃদয়ে হঠাৎ এই ভাবটার আবির্ভাব হইয়া ক্ষণকালের জন্য তাঁহার সকল দুষ্টামি উড়িয়া গেল। গোবিন তাঁহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া দ্বিতীয় বার চাহিতে গিয়া, আর সে দুষ্টামি দেখিতে পাইলেন না। বোধ হইল সে বালিকা এক নব-ভাব-মণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া যেন তাঁহার অপেক্ষা কোনও উচ্চতর লোকে উঠিয়া যাইতেছে! এই ভাব লইয়া উভয়ে নিজ নিজ শয্যাতে গেলেন। সৌদামিনী শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "একি! এ মানুষ আমার মনকে এমন করিয়া জড়ায় কেন?"

গোবিনের মনেও অপ্রত্যাশিতরূপে নবভাবের অভ্যুদয়। তিনি এই অল্প বয়সে কলিকাতা সহরের বাজারের এক তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোকের সহিত বৈঠক করিয়া থাকিবেন, কিন্তু এরূপ বঁড়শী-গাঁথা ভাবটা কখনও অনুভব করেন নাই।

সে রাত্রে গোবিন ঘুমাইতে যান, সেই বড় বড় দুটী চোক মনে পড়ে; সেই শেতারের পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলির ক্রীড়া মনে পড়ে; সেই বেহালার ছড়িটীর সহিত আন্দোলিত বাহুলতাটী মনে পড়ে; সেই উজ্জ্বল রূপের প্রভা মনে পড়ে; সেই সুললিত হৃদয়-দ্রবকারী কণ্ঠের স্বরটী মনে পড়ে। গোবিন উঠিয়া বসিয়া, এপাশ ওপাশ করিয়া, রাত কাটাইলেন।

রাত্রে নয়ন-তারার ভাল নিদ্রা হইল না; অনেকক্ষণ পিতার পীড়ার চিন্তাতে গেল। কেন বাবার শরীরটা দিন দিন এত খারাপ হচ্চে? সে সম্বন্ধে কি কর্‌তে হবে ইত্যাদি। তৎপরে হরেন্দ্রের চিন্তাও আসিল। নিশ্চয় তিনি কোনও প্রকার ক্লেশে আছেন, নতুবা আমাকে দুই দুইবার খুঁজিবেন কেন? বাপ্‌রে কি কষ্টটাই এই মানুষটার উপর দিয়া গেল। মানুষ খুব শক্ত তাই সয়ে উঠতে পারলেন, অন্যে হলে ভেঙ্গে পড়ত। দুঃখই বা কেন করি, এরূপ সংগ্রামে না পড়লে কি মানুষ মানুষ হয়? এই ত বেটাছেলে যে আপনার পায়ে আপনি দাঁড়ায়। কিন্তু মনের ভারটা যে একটু লঘু করবো তারও যো নেই, ভেঙ্গেত কিছু বলেন না। কেহ গরীব বলে দয়া করছে ভাবলে তার ত্রিসীমায় যাবেন না। এরূপ মানুষ নিয়ে কারবার করতে সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হয়। আহা! দু দু বার এলেন দেখা হলো না!" এইরূপ

ভাবিতে ভাবিতে রাত্রির অধিকাংশ কাল জাগিয়া রহিলেন। প্রাতে উঠিয়া হরেন্দ্রকে আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। ভৃত্য পত্রখানি ফিরিয়া আনিল; তৎপৃষ্ঠে পেনসিলে লেখা—"সমাজে উপাসনাতে যাচ্চি, পরে যাব।"

সমস্ত দুপরটা নয়ন-তারা একাকিনী নিজের ঘরে উন্মনস্কভাবে যাপন করিলেন, "কখন আসেন, কখন আসেন।" হরেন্দ্র আসিলেন না। আজ রায় মহাশয়ের শরীরটা একটু ভাল, তিনি অপরাহ্নে বৈঠক ঘরে গিয়া বসিলেন, কন্যাদের ওস্তাদকে অগ্রেই সংবাদ দিয়া আনাইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত গোবিনের পরিচয় করিয়া দিলেন, ও সঙ্গীতবিদ্যা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। নয়ন-তারাও আকৃষ্ট হইয়া সেখানে গমন করিলেন।

এদিকে হরেন্দ্র নয়ন-তারার উদ্দেশে আসিয়া উপস্থিত। এবারে ঘটনা চক্রে এ কি রূপ ঘটিতেছে! তিনি যখন নয়ন-তারাকে বড়ই চান, তখন বার বার আসিয়া দেখা হইতেছে না। এবারে আসিয়া তাঁহাকে না পাইয়া বেচারার মনে বিরক্তির সঞ্চার হইল। ভাবিতে লাগিলেন—"এঁদের এই একটা দোষ, মানুষের স্বভাব চরিত্র না দেখে যাকে তাকে একেবারে পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করতে দেন। গোবিন কি এঁদের সঙ্গে মেশবার মত লোক! ওর সঙ্গে এতটা মাখামাখি কি ভাল?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিরক্তিটা এতদূর বাড়িয়া উঠিল, যে আর অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল না, আবার চলিয়া গেলেন। একটু অপেক্ষা করিলেই নয়ন-তারার সহিত সাক্ষাৎ হইত সেটা আর হইল না। নয়ন-তারা কিয়ৎক্ষণ পরে নিজঘরে আসিয়া তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই হায় হায় করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন তৎপর দিবস অনন্যকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিবেন, দেখা করিতেই হইবে। কিন্তু ভবিতব্যতার দ্বার কে বন্ধ করিতে পারে? সন্ধ্যার পরেই গৌরীপদ রায় মহাশয়ের ভবন হইতে লোক আসিয়া উপস্থিত। অবিনাশের বালিকা-পত্নীর বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশের অধিক হইবে না, ইহারই মধ্যে সন্তানের মুখ দর্শন করিয়াছে। কিছুদিন হইল সে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। শিশুটী সূতিকা গৃহেই সপ্তাহ কালের মধ্যে গতাসু হইয়াছে, এবং জননী ঘোর সূতিকা-জ্বরে ভুগিতেছে। রায় পরিবারের মহিলাগণ ইতিমধ্যে কয়েকবার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু দুই দিন

হইতে পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, এখন বধূটীর জীবন সংশয়। চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন এখন শুশ্রূষার বিশেষ বন্দোবস্ত না করিলে চলিতেছে না। তাঁহারা যেরূপ যেরূপ করিতে বলিতেছেন, প্রাচীনা রমণীগণের দ্বারা কিছুতেই তাহা হইয়া উঠিতেছে না; সুতরাং শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিবার জন্য নয়ন-তারার প্রয়োজন। নয়ন-তারা তাড়াতাড়ি এ বাড়ীর কাজের বন্দোবস্ত করিয়া এবং নন্দরাণী ও সৌদামিনীকে গৃহস্থালির ভার দিয়া লোকের সঙ্গে গৌরীপদ বাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার পদার্পণমাত্র সে বাড়ীর লোকের দুর্ভাবনা দূর হইল। তাঁহারা তাঁহার হস্তে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা-পত্র ও ঔষধ প্রভৃতি বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি পরিচর্য্যাকারী ও কারিণীদিগকে কি কি করিতে হইবে আদেশ দিয়া, রোগীর পার্শ্বের ঘরে তত্ত্বাবধারিকারূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বধূটীর ঘোর বিকারের অবস্থা; ঔষধ খাওয়াইতে গেলে চামচ কামড়াইয়া ধরে; সর্ব্বদা হাত পা ছোড়ে; কাছে ঘেঁষিতে পারা যায় না; মধ্যে মধ্যে ঝাঁকিয়া উঠে যেন পলাইতে চায়; মধ্যে মধ্যে একটু চৈতন্য হয় এইমাত্র। নয়ন-তারার কি মোহিনীশক্তি! যেই অবনত হইয়া বলেন—"বৌ! লক্ষ্মি! হাঁ করত ঔষধটা খাও" অমনি বালিকাটী চাহিয়া দেখে, তাঁহাকে যেন চিনিতে পারে, ও ঔষধটা খায়। এইরূপে দিন রাত্রি রোগীর সহিত সংগ্রাম চলিল। নয়ন-তারার বিশ্রাম নাই। রাত্রে মধ্যে মধ্যে অবিনাশকে ও চারুকে রোগীর নিকট বসাইয়া তিনি একটু বালিশে মাথা রাখেন। কিন্তু সে কতক্ষণ? রোগী যখন ঝাঁকিয়া উঠে, ও উপদ্রব আরম্ভ করে, তখন আবার তাঁহাকে ছুটিয়া যাইতে হয়। গিয়া বলেন—"ছি ছি বৌ-মানুষের কি অমন করে উঠতে আছে, শুয়ে থাক; লক্ষ্মি! আমার কথা শোন।" বৌটী তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আবার শুইয়া পড়ে।

এইত গেল রোগীর সঙ্গে সংগ্রাম; কেবল ইহাই নহে, বেচারা অবিনাশ তাহার এই বালিকা পত্নীটীকে বড়ই ভালবাসে। নিজে ঘরে মাষ্টারি করিয়া তাহাকে পড়াইয়াছে; সে এখন বেশ বাঙ্গলা পড়িতে ও লিখিতে পারে। বৌটী শান্ত, শিষ্ট, বাধ্য, সকলের অনুগত, বাড়ীর সকলের প্রিয়। যতই তাহার রোগ সঙ্কট অবস্থার দিকে চলিয়াছে, ততই অবিনাশের মুখ বিষাদে মলিন হইয়া আসিতেছে। এতদিন গৃহের অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ সর্ব্বদা রোগীর নিকট থাকিতেন, সে বেচারা কাছে ঘেঁষিতে পারিত না;

কাহাকেও মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিত না। কেবল দূরে দূরে মুখটী চূণ করিয়া বেড়াইত। নয়ন-তারা আসাতে সে রোগীর নিকট বসিতে পাইতেছে। বৌটী যখন এক একবার ঝাঁকিয়া উঠে, চক্ষু বাঁকায় ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে থাকে, তখন অবিনাশ সে দিকে তাকাইতে পারে না; নিকটস্থ টেবলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে থাকে। রাত্রে একা যখন বসিয়া থাকে, তখন বৌটীর যদি একটু চেতনা হয়, সে চিনিতে পারে ও সপ্রেম ভাবে কোলের উপরে হাতখানি তুলিয়া দেয়, অবিনাশ সেই হাতখানিতে চুম্বন করিয়া কাঁদিতে থাকে। এক একবার নয়ন-তারার হাত ধরিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করে "সোণা দিদি! ও কি বাঁচবে না?" এইরূপে নয়ন-তারাকে রোগীকে সামলাইয়া আবার অবিনাশকেও সামলাইতে হয়।

সকল চেষ্টাই বিফল হইল। বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯টার সময় প্রাণবায়ু সেই রোগভগ্ন দেহলতাকে ত্যাগ করিয়া গেল। এ কয়দিন অনাহার অনিদ্রাতে নয়ন-তারার দিন কোথা দিয়া গেল, তাহা জানিতেও পারিলেন না। শুক্রবার প্রাতে তিনি স্বীয় ভবনে ফিরিয়া আসিলেন। দুপর বেলা একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন, কয়দিনের উত্তেজনাতে শরীর মন এতই উত্তেজিত যে নিদ্রা হইল না। বৈকালে হরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ। এই কয়দিন হরেন্দ্রও গুরুতর মানসিক ক্লেশে যাপন করিয়াছেন। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন নিজের দুঃখ কাহাকেও জানান তাঁহার প্রকৃতি নয়। তিনি বাড়ীর দেনার কথা কাহাকেও বলেন নাই। ইহার মধ্যে দুই দিন কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তাঁহার দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া, অপর একজন পরিচিত বন্ধুর নিকট টাকা চাহিয়াছিলেন; বড়ই আশা করিয়াছিলেন, যে সে ব্যক্তি দুঃখের দুঃখী হইয়া সাহায্য করিবে; কিন্তু সে ব্যক্তি বিষয়ী লোক, এমন ঠাণ্ডা ভাবে তাঁহার কথা শুনিয়াছে ও বিদায় করিয়া দিয়াছে, যে তাঁহার হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। সেই অপমান ক্লেশে দুই দিন নিদ্রা হয় নাই। মহেন্দ্রনাথকে কিছু বলেন নাই, পাছে রায় মহাশয়ের কর্ণগোচর হয়। পাছে কাহারও মনে হয় তিনি অর্থসাহায্যের লোভে এই রায় পরিবারের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ, এই ভয়টা অতিরিক্ত মাত্রায় তাঁহার মনে কাজ করে; তিনি নিজের আর্থিক অভাব ইহাদিগকে কোনও রূপে জানিতে

দেন না। ইহার উপরে কয়েক দিন বার বার নয়ন-তারার সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। গোবিন কণ্টক কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে। নিজের দুঃখ ক্লেশের ভিতরে এ বিরক্তিটাও আছে। এই প্রকারে উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত ও তিক্ত মনটা লইয়া তিনি আজ নয়ন-তারার নিকট উপস্থিত।

নয়ন-তারা। আঃ আপনি এলেন বাঁচলাম, কদিন থেকে মনটা আপনাকে দেখ্‌বার জন্যে বড়ই ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। কদিন শরীর মনের উপর দিয়ে কি ঝড়ই গিয়েছে!

হরেন্দ্র। এ কয়দিন আমার মনটাও বড় খারাপ আছে। আপনি যে সংগ্রামে ছিলেন, তার খবর সব পেয়েছি। বৌটীকে কোন রূপেই বাঁচান গেল না?

নয়ন-তারা। চেষ্টার ত ত্রুটী হয় নি, শুনেছি এ রোগে স্ত্রীলোক প্রায় বাঁচে না। অত ছেলেমানুষের সন্তান হলে প্রায় একটা বিভ্রাট ঘটে।

হরেন্দ্র। বৌটীর বয়স কত?

নয়ন-তারা। তের কি চৌদ্দ বছর হবে, আমাদের টুনীর চেয়েও কয়েক মাসের ছোট। ভাবুন না কেন ব্যাপারটা কিরূপ। আমাদের টুনীটাকে দেখলে কি কারু মানুষ বলে মনে হয়? সেইরূপ শিশু ত?

হরেন্দ্র। শুনেছি অবিনাশ বৌটীকে বড় ভাল বাসত।

নয়ন-তারা। সে কথায় কাজ কি, সে একেবারে পাগলের মত হয়ে উঠেছে।

হরেন্দ্র। যাঃ বেচারা এবারে বি,এ, টা দিত, সে সব গেল।

নয়ন-তারা। আর বি,এ, এখন এই ধাক্কা সামলাক, তার পর বি,এ, পাস করা। (একটু থামিয়া) ও কথা থাক্ আপনি বার বার আমার জন্যে এলেন আর চলে চলে গেলেন, একটু অপেক্ষা করতে নেই, তা হলে দেখা হতো।

হরেন্দ্র। বাপ্‌রে আপনি আজ কাল যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছেন, কেবল বড় বড় লোক নিয়ে ব্যস্ত, আমার মত গরীব লোকের সাধ্য কি যে আপনার কাছে ঘেঁষে!

নয়ন-তারা। ওঃ গোবিন বাবুর প্রতি কটাক্ষ করে বলা হচ্ছে, বাড়ীতে একজন অতিথি আস্‌বে, তার জন্যে ব্যস্ত হব না।

হরেন্দ্র। আপনাদের অতিথির পায়ে নমস্কার, আপনাদের পায়েও নমস্কার। আপনাদের কাছে মুড়ী মিছরির এক দর।

নয়ন-তারা। সাধে আপনাকে দাদা গোঁড়া বলেন ?

হরেন্দ্র। আমার গোঁড়াম আমাতে থাক, আপনাদের উদারতা যেন কখনও পাই না। আপনার বাবার সব ভাল এই অত্যধিক উদারতাতে সর্ব্বনাশ করেছে; যাকে তাকে কি বাড়ীতে পূরলেই হলো, এতদিন যে একটা বিভ্রাট ঘটে নি, এই ঈশ্বরের কৃপা।

পিতার প্রতি কটাক্ষ করাতে নয়ন-তারার মন অগ্নিময় হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া গঙ্গাধারের জানালার নিকট গেলেন ও মনের আবেগ সম্বরণ করিতে লাগিলেন।

হরেন্দ্র। শুনবেন ঐ গোবিন কিরূপ লোক ?

নয়ন-তারা। (হাত যুড়িয়া) রক্ষে করুন ও জ্ঞান আপনার কাছেই থাক, আমি আপনার কাছে আর একজন ভদ্রলোকের নিন্দে শুনতে আসি নি।

হরেন্দ্র। আমি ছেলে বেলা হতে ঐ গোবিনদের পাড়াতে ছিলাম, ওর বিষয় সকলি—

নয়ন-তারা। (বিরক্তভাবে) আঃ বারণ করছি আমার কাছে ও সব কথা বলবেন না। বাপ্‌রে বাপ্ ব্রাহ্মেরা মানুষের উপর কি চোক রাঙ্গায়! এই জন্যেই ত লোকে ব্রাহ্মদের দেখ্‌তে পারে না।

হরেন্দ্র। (উঠিয়া দণ্ডায়মান) গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে; শেষে বুঝতে পারবেন।

এই বলিয়া বিরক্তির সহিত চলিয়া গেলেন। নয়ন-তারার একবার ইচ্ছা হইল বসিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁহারও মন তখন উত্তেজিত। ভাবিলেন এতই কি সাধাসাধি, যান না বয়েই গেল। গোঁড়া মানুষ নিয়ে কারবার করাই কঠিন। এটা বুঝলেন না, তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ, তাতে গোবিন বাবু বাড়ীতে আসতে চাইলে আমরা "না" বলি কি করে, আর কার কোথায় কি দোষ আছে, তাই কি আমরা খুঁজে বেড়াব? থাকলই বা দোষ আমরা ভাল থাকলেই হলো। মানুষটার সব ভাল এই গোঁড়ামিতেই খেয়ে রেখেছে। রাগ করে গেলেন যান, গরজ থাকেত আপনি আসবেন, আমি

সাধাসাধি করবো না।” এই বলিয়া রাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরক্ষণেই মনে হইল, হরেন্দ্র বলিয়াছিলেন যে এই কয়দিন তাঁর মনটাও খারাপ আছে। অমনি মনে দুঃখ হইল। “মনটা খারাপ আছে বলে জুড়োবার জন্যে আমার কাছে এলেন, আর আমি এই ব্যবহার করলাম, রাগ করে বকে তাড়ালাম। ছি! ছি! কি কঠিনের মত কাজটা হলো।” এইরূপ ভাবিয়াই রাগটুকু জল হইয়া গেল। মনটা আবার হরেন্দ্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। উঠিয়া একখানি পত্র লিখিলেন; তাহার মর্ম্ম এই :—

“আপনি বল্লেন কয়দিন আপনার মনটা খারাপ আছে, তা শুনেও কঠিনের মত আপনার প্রতি রাগ করে বিদায় কর্‌লাম। এজন্য মনে বড়ই ক্লেশ হয়েছে। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন। আমারও শরীর মনটা ভাল ছিল না, সেই জন্যেই বোধ হয় এমনি করেছি। যাহোক আজ রাত্রে যদি নিতান্ত না আসেন, কাল প্রাতে অবশ্য অবশ্য একবার আস্‌বেন, না হলে বুঝ্‌বো যে আমাকে ভালবাসেন না।”

হরেন্দ্রের মনটা বাস্তবিক বিরক্ত হইয়াছিল; তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছিলেন, যে না ডাকলে আর যাব না। এমন সময়ে পত্রখানা পাইলেন। পড়িয়াই মনে মনে বলিলেন, “তাইত এমন সময়ে অমন কথাটা উথাপন করা উচিত হয় নি। এ কয়দিন অনাহার অনিদ্রাতে তাঁর শরীর মন দুই উত্তেজিত ছিল। নতুবা আমার উপরেত তাঁর রাগ কখনও দেখিনি! ছি! ছি! আমারই অন্যায় হয়েছে। আমারই মাপ চাওয়া উচিত। কাল প্রাতে দেখা কর্‌বো।”

পরদিন প্রাতে হরেন্দ্র নয়ন-তারার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) তবু ভাল আপনি যে বড় এলেন, আমিত ভাবি নাই এত সহজে আস্‌বেন।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) আমি মাপ চাইতে এসেছি।

নয়ন-তারা। মাপ চাওয়া কি জন্যে?

হরেন্দ্র। কয়দিনের সংগ্রামে আপনার শরীর মন দুই উত্তেজিত ছিল, সেটা আমার ভুলে যাওয়া উচিত হয় নি, বড় চোয়াড়ের মত কাজটা হয়েছে।

হরেন্দ্র এই কথাগুলি এমনভাবে বলিলেন, যে নয়ন-তারা গলিয়া একেবারে জল হইয়া গেলেন। প্রেমপূর্ণ নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি এত ভাল হলেন কি করে?"

হরেন্দ্র। ভাল আর কি! খারাপ কাজটা করে বলে ফেলাই ভাল।

নয়ন-তারা। আপনার মনটা এ কয়দিন খারাপ আছে বল্লেন, কারণটা কি?

হরেন্দ্র। সেটা এখন বল্‌ছি না?

নয়ন-তারা। ও হোঃ বুঝেছি অভিমানটা এখনও যায় নি।

হরেন্দ্র। না না অভিমানের জন্যে নয়, বল্‌তে কিছু বাধা আছে।

নয়ন-তারা। কিসের বাধা, আমাকে কি ভালবাসেন না? আপনার লোক মনে করেন না?

হরেন্দ্র। তাত বুঝ্‌তেই পারেন।

নয়ন-তারা। তবে কেন বল্‌ছেন না?

হরেন্দ্র। সময় হলে বল্‌বো (গমনোদ্যত)

নয়ন-তারা। আমি কিন্তু অভিমান করে রইলাম। আপনি আমাকে বাইরে ফেলে দিলেন।

হরেন্দ্র। তা যদি মনে ভাবেন নাচার, বিশেষ আপত্তি না থাকলে আর আপনাকে বলি না।

হরেন্দ্র চলিয়া গেলেন; নয়ন-তারা একটু বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন;—মনে কি ক্লেশটা রয়েছে জান্‌তে পারা গেল না। এটা মহেন্দ্রবাবুর দ্বারা জান্‌তে হচ্ছে। বোধ হয় টাকাকড়ি ঘটিত কোনও কষ্ট হবে। আমরা শুন্‌লে পাছে কোনও রূপে সাহায্য করি! কি মানুষ! সাধে ভালবাসি!

আর অধিক বসিতে পারিলেন না, গৃহকার্য্যে যাইতে হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর রায় মহাশয়ের শরীরটা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। উদরের একপ্রকার বেদনা, অজীর্ণ, ও স্বল্প মাত্রায় জ্বর, এগুলি লাগিয়াই থাকিল। কোন প্রকারেই উপশম করিতে পারা গেল না। তিনি দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনগণ চিন্তান্বিত হইতে লাগিলেন। চুঁচড়ার ভাল ভাল ডাক্তারগণ রোগটা যে কি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অপর পারে কাঁচড়াপাড়া হইতে একজন সুযোগ্য কবিরাজ আনিয়া দেখান হইল ; তিনি যাহা বলিলেন তাহা ও বাড়ীর লোকের মনঃপূত হইল না। অবশেষে ডাক্তারদিগের পরামর্শ অনুসারে চলাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। তাঁহারা কিছুদিন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। সেই পরামর্শই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল।

ও দিকে গোবিন প্রতি সপ্তাহে আসিতেছেন। গোবিনের সহিত পরিচয় হওয়ার পর, সুরেশ বলিয়াছেন—He is a gain to us—অর্থাৎ এ মানুষটাকে পেয়ে লাভ বোধ হচ্চে।" আর লাভ বোধ না হবেই বা কেন, গান বাজনা, আমোদ, হাস্য পরিহাসে গোবিনকে অদ্বিতীয় বলিলেই হয় ; বয়সেও সুরেশের সমবয়স্ক ; মাসে প্রায় দেড় দু হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন ; চলন বলন ধরণ ধারণ সমুদয় সভ্যরীতির অনুরূপ ; এমন মানুষকে সুরেশ কেন ভাল না বাসিবেন। তৎপরে প্রথম সাক্ষাতের সময় হইতেই নন্দরাণী গোপনে তাঁহাকে বলিয়াছেন যে সৌদামিনীর প্রতি গোবিনের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে ; ইহাও সুরেশের গোবিনের প্রতি আকর্ষণের একটা কারণ।

নন্দরাণী যে কেবল স্বীয় পতিকে গুপ্তকথাটা বলিয়াছেন তাহা নহে, নয়নতারাকেও বলিয়াছেন। তদবধি নয়ন-তারার মনে একটু চিন্তার সঞ্চার হইয়াছে। তিনি সৌদামিনীর ভাব গতিক লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিতে পাইয়াছেন, সৌদামিনীর উপহাস-প্রবৃত্তি আর নাই। গোবিনের বিষয়ে মতামত

জিজ্ঞাসা করিলে, স্বীয় ভাব গোপনেরই প্রকাশ পান; উপরে উপরে কিছু বলেন না। ও দিকে গোবিন চুঁচড়াতে যে সময়টা থাকেন, তাঁহার মন প্রাণ যেন সৌদামিনীর সঙ্গেই থাকে; অনেকটা সময় দুজনকে একত্র দেখা যায়। এই ভাবটা লক্ষ্য করা অবধি নয়ন-তারার মন সুস্থির নয়। হরেন্দ্রের সহিত রাগারাগি হওয়ার পর গোবিনের বিষয়ে একটা ভাবনা তাঁহার মনে প্রবেশ করিয়াছে। একদিকে মণিলাল বাবুদের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে গোবিনের প্রতি পরের মত ব্যবহার করা অসম্ভব; অপরদিকে হরেন্দ্রের বিরাগ। কেন এত বিরাগ? সমুচিত কারণ অবশ্যই আছে। রাগ পড়িয়া গেলে হরেন্দ্রকে একদিন বলিলেন—"গোবিন বাবুর বিষয়ে কি জানেন বলুন। তাঁরা আমাদের আত্মীয় লোক, তাঁরা বাড়ীতে এলে আপনার জ্ঞান না করা অসম্ভব। তাঁর স্বভাব চরিত্র যদি ভাল না হয়, আমাদের একটু সাবধান থাকাই কর্ত্তব্য।" হরেন্দ্র আর সহজে বলিবার পাত্র নন। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে অভিমানের মাত্রাটা বিলক্ষণ আছে; একবার বাধা পাইয়া আর বলিতে চাহিলেন না। এইমাত্র বলিলেন—"আমি আর কিছু বল্‌ছি না, অন্য কারুর কাছে জানবেন।" নয়ন-তারা অবশেষে মহেন্দ্রবাবুর দ্বারা ও কলিকাতা হইতে সমাগত পিতৃব্যপুত্রদিগের দ্বারা যতটা সম্ভব অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সৌদামিনীর ভাব দর্শনেই তাঁর এতটা ব্যগ্রতা। তিনি দেখিলেন, সৌদামিনী দিন দিন গোবিনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এ কথা হরেন্দ্র বা অপর কাহাকেও বলিলেন না। কেবল একদিন সৌদামিনীকে গোপনে এইমাত্র বলিলেন, "দেখ সদু! আমাদের বাড়ীতে যে কোনও ভদ্রলোক আসুন, সকলের আতিথ্য করতে ও সকলের প্রতি সৌজন্য ভদ্রতা দেখাতে আমরা বাধ্য; কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু করতে হ'লে জানা আবশ্যক মানুষটা কেমন।" ইহার অধিক এ বিষয়ে চিন্তা করার অবসর আর রহিল না; তিনি পিতাকে লইয়া দিন দিন ব্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। হরেন্দ্র গোবিনের ঘন ঘন যাতায়াত দেখিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তিনিত আর ঘরের কথা জানেন না; কে গোবিনকে বঁড়শী-গাঁথা করিয়া ঘুরাইতেছে, তাত বুঝিলেন না; তিনি মোটামুটি মনে করিলেন, নয়ন-তারার সঙ্গেই গোবিনের প্রথম আলাপ, গোবিন নয়ন-তারার পশ্চাতেই ঘুরিতেছে। এটা তাঁর অসহ্য

বোধ হইতে লাগিল। ভাবিতে গেলেই মন বৃশ্চিক-দংশনের ক্লেশ অনুভব করে; তাঁর ধৈর্য্য থাকে না।

কেবল যে গোবিন ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন তাহা নহে, রায় মহাশয়ের পীড়া যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই চুঁচড়ার ভদ্রলোকদিগের ও কলিকাতার বন্ধুদিগের যাতায়াত আরম্ভ হইল। তারাপদ রায় মহাশয় প্রায় সপ্তাহে দুই বার আসিতে লাগিলেন। একদিন এস, পি, রায় সপরিবারে আসিয়া এক রাত্রি থাকিয়া গেলেন; বানর্জ্জি সাহেবও কয়েক বার আসিলেন। এ সকল আতিথ্যের ভার এখন প্রধানতঃ সৌদামিনী ও নন্দরাণীর উপরে পড়িয়া যাইতে লাগিল। তবে নয়ন-তারা গৃহের কর্ত্রী কিয়ৎ পরিমাণে সে বোঝা তাঁহাকেও বহিতে হইল।

এইরূপে দিন যায়; একদিন প্রাতে মণিলালবাবু আসিয়া উপস্থিত। দুই উদ্দেশ্য। প্রথম রায় মহাশয়কে দেখিয়া যাওয়া; দ্বিতীয় নয়ন-তারাকে দুই দিনের জন্য আপনাদের ভবনে একবার লইয়া যাওয়া। নয়ন-তারা চলিয়া আসার পর তাঁহাদের বৃদ্ধ কর্ত্তা বাড়ীর বৃদ্ধা মহিলাগণের মুখে তাহার অনেক প্রশংসা শুনিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন—"মেয়েটী বেশ শান্ত, শিষ্ট, বিনয়ী, ভগবানের নামে চক্ষে জল পড়ে, ওদিকে আবার লিখ্‌তে পড়তে গাইতে বাজাতে পরিপক্ক; এই সকল কথা শুনিয়া কর্ত্তা বলিয়াছেন, "কালীপদর মেয়েটীকে আমায় দেখালে না কেন? এবারে আমাদের বাড়ীতে যখন কীর্ত্তন হবে মেয়েটীকে এন।" ভিতরকার কথা এই, পঠদ্দশায় রায় মহাশয়ের এ বাড়ীতে খুব যাতায়াত ছিল। তখন হইতে বৃদ্ধ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বভাব চরিত্রের গুণে তাঁকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। পরে তাঁর রীতি নীতির পরিবর্ত্তন হওয়াতেও সে স্নেহটা যায় নাই। বৃদ্ধ অতি উদার মানুষ; সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন,—"মানুষ যা বোঝে সেই রকম থাকাই ভাল। কালীপদকে প্রশংসা করি, তার মুখে একখানা বাহিরে আর একখানা নাই; যা ভাল বলে বোঝে তাই করে; এমন খাঁটি লোক একালে মেলে না।" রায় মহাশয়ও তাঁহাকে পিতার ন্যায় দেখিয়া থাকেন। প্রেমের স্বভাব এই ইহা যাহাকে ধরে, যত দূর তার গন্ধ পায় ততদূর যায়। বৃদ্ধ কর্ত্তার স্নেহটা নয়ন-তারার গুণের কথা শুনিয়া কালীপদ রায় হইতে তাঁহাতেও সংক্রান্ত হইয়াছে।

যে দিন প্রাতে মণিলালবাবু আসিয়া উপস্থিত, সেই দিন সায়ংকালে তাঁহাদের ভবনে এক প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়া দলের কীর্ত্তন হইবে। পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় কর্ত্তা মণিলালবাবুকে নয়ন-তারাকে আনাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। ইহাতে মণিলালবাবু অতিশয় প্রীত। নয়ন-তারাকে কেহ ভাল বলিলে বা দেখিতে চাহিলে তাঁর বড়ই আনন্দ হয়; তাঁর মনে হয় তাঁর দলে আর একজন লোক যুটিল। সুতরাং কর্ত্তা বন্ধুর কন্যাকে দেখিতে চাওয়াতে তাঁর মহা উৎসাহ হইয়াছে; তিনি সেই উৎসাহে স্বয়ং তাঁহাকে লইবার জন্য আসিয়াছেন। কিন্তু নয়ন-তারা যাইতে ইচ্ছুক নহেন। পিতার পীড়ার বৃদ্ধির জন্য তাঁহার হাত পা আর উঠে না। নিরন্তর পিতাকে লইয়া ব্যস্ত আছেন। যথাসময়ে ঔষধটী সেবন করান, যথাসময়ে পথ্যটী দেওয়া, প্রাতে সন্ধ্যাতে কাছে বসিয়া ভগবানের নাম গাইয়া শুনান, দুপর বেলা তাঁহার শয্যাতে বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলান, মধ্যে মধ্যে ভাল গ্রন্থাদি পড়িয়া শুনান, এ সকল তাঁর কাজ। নন্দরাণী ও সৌদামিনীর প্রতি গৃহকার্য্য দেখিবার ভার কিছু অধিক পরিমাণে দিয়া, তিনি পিতার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। সুতরাং তিনি কিরূপে যান?

রায় মহাশয় ও গৃহিণী মণিলালবাবুর আগ্রহ দেখিয়া নয়ন-তারাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পিতা বলিলেন, "আমার ব্যায়রাম ত এমন নয়, যে দেখ্ দেখ্ করতে বেড়ে যায়, দুদিনে আর বেশি খারাপ কি হবে, তুমি যাও, কর্ত্তা তোমাকে দেখ্তে চেয়েছেন, এটা আনন্দের কথা, তিনি আমাকে সন্তানের মত দেখেন, না গেলে কি মনে কর্বেন। আর একটা কথা তোমারও দুদিনের জন্য বিশ্রাম হবে।" জননী বলিলেন, "তা বৈকি বৌমা ও সদী কি দুদিন সংসারটা চালাতে পার্বে না? আর ওঁকে দেখ্বার জন্যেত আমি আছি। কর্ত্তা আমাদের স্নেহ করেন, দেখ্তে চেয়েছেন মা, এমন বুড়ো মানুষ কখনও দেখিস্ নি।"

মণিলালবাবুর আগ্রহে পিতা মাতা যোগ দেওয়াতে নয়ন-তারার কিছু মুস্কিল হইল। তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কোন প্রকারেই যাইতে মন উঠে না। একে পিতাকে এরূপ অবস্থাতে রাখিয়া যাওয়া, দ্বিতীয় একলা যাওয়া। পিতা মাতার আদেশ শুনিয়াও তিনি অনেকক্ষণ

মণিলালবাবুকে সাধ্যসাধনা করিলেন, "জেঠা মশাই, আমাকে মাপ করুন, আমি বাবাকে ফেলে যেতে পারব না।" মণিলালবাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন। "লক্ষ্মি, চল চল, তোমার বাবার ব্যায়রাম দুদিনে এমন কি বাড়বে? দুদিন একটু নড়ে চড়ে এস, সংসারের কাজ ত আছেই।"

নয়ন-তারা। আমার একলা যেতে মন সরে না।

মণিলাল। তোমার জেঠাইমা ত আছেন, তিনিই তোমার মায়ের কাজ করবেন।

নয়ন-তারা মনের সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মনে হরেন্দ্রের বিরাগের ভয়টাও আছে। যে গোবিন বাড়ীতে আসাতে তিনি এত বিরক্ত, সেই গোবিনের বাড়ীতে গিয়া থাকা, আবার একলা গিয়া থাকা, ইহা হরেন্দ্র কখনই পছন্দ করিবেন না। দূর হোক্ এরূপ স্থলে না যাওয়াই ভাল। আবার ভাবিলেন বৃদ্ধ কর্ত্তা আগ্রহ করে দেখতে চেয়েছেন না যাওয়াটা কি ভাল? থাকিলেনই বা গোবিন, গোবিন ত আমাকে চান না, তিনি যাকে চান, সে চুঁচড়াতেই রহিল। অমনি মনে হইল, "একবার গেলে মন্দ হয় না, গোবিনবাবুর স্বভাব চরিত্রটা জেনে আসা যায়, দুজনের যেরূপ ভাব দাঁড়াচ্চে, কি ঘটে কে জানে, মানুষটার বিষয় সমুদয় কথা জানাই ভাল। এইরূপ ইতস্ততঃ করিতেছেন, ওদিকে মণিলালবাবু বাড়ীর গাড়ি যুতাইয়া আনিয়া ত্বরা দিলেন, "শীঘ্র কাপড় পর গাড়ী প্রস্তুত; আর সময় নাই; ২—১০ মিনিটের ট্রেণ ধরতে হবে।" এই বলিয়া নয়ন-তারাকে ধরিয়া একপ্রকার বলপূর্ব্বক ঠেলিয়া তাঁহার ঘরে কাপড় পরিবার জন্য লইয়া গেলেন। কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তাড়াতাড়ি সংসারের বন্দোবস্ত করিয়া নন্দরাণী ও সৌদামিনীকে বুঝাইয়া দিয়া, পিতা মাতার নিকট বিদায় লইয়া, কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল। তাড়াতাড়ি হরেন্দ্রকে একখানা পত্র লিখিয়া টুনীর কাছে দিয়া গেলেন,—"হরেনবাবু পড়াতে এলেই দিস্।" তাহাতে হঠাৎ কলিকাতা যাত্রার কারণ ভাঙ্গিয়া লিখিলেন।

তাঁহারা কলিকাতায় মণিলালবাবুর বাড়ীতে পৌছিলে পরিবারস্থ মহিলাগণ অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী বাস্তবিক

মায়ের স্থান অধিকার করিলেন। কাপড় ছাড়াইয়া, বিশ্রাম করাইয়া, জলযোগ করাইয়া, তাঁহার উত্তেজিত শরীর মনকে অনেকটা সুস্থ করিলেন।

বৈকালে বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে কীর্ত্তনের আয়োজন হইতে লাগিল। ওদিকে কর্ত্তা নয়ন-তারার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্ত এ বাড়ীতে আসিলেন। "কৈ শুন্‌লাম কালীপদর মেয়ে এসেছে, মেয়েটী কোথায় ?" নয়ন-তারা বাহিরে আসিয়া চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি লইলেন।

কর্ত্তা। নাত্নি! তুমি এসেছ আমি খুসী হয়েছি। কালীপদ যখন স্কুলে পড়ে, তখন থেকে আমাদের বাড়ীর ছেলের মত। তবে তার মতি গতি অন্তপ্রকার হয়েছে; তা কি করা যাবে? কৃষ্ণ যাকে যেমন রাখেন।

মণিলাল। কালীপদর বড় ব্যায়রাম, ওকে কি আনা যায়, নিতান্ত আপনি ডেকেছেন বলে এসেছে।

কর্ত্তা। বটে, কি ব্যায়রাম ?

মণিলাল। তা কেউ বুঝ্‌তে পারে না, হজম হয় না, পেটে ব্যথা হয়, তারপর একটু জর লেগেই আছে। দিন দিন কাহিল হয়ে পড়ছে।

কর্ত্তা। তবে ওকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে আন্‌লে কেন ?

মণিলাল। মনে কর্‌লাম কীর্ত্তনটা একবার শুনুক।

কর্ত্তা ইহাতে প্রসন্ন হইলেন। কর্ত্তার বয়ঃক্রম প্রায় ৮০ বৎসর হইবে; কিন্তু দেহে এখনও বিলক্ষণ বল আছে; আজও প্রাতে রীতিমত পদব্রজে গঙ্গাস্নানে গিয়া থাকেন; মানুষটী খর্ব্বাকৃতি, যেন গিলে বিচীটীর মত; তবে বার্দ্ধক্য বশতঃ দেহে বলি দেখা দিয়াছে; বর্ণটী শ্যাম; রূপটী সুস্নিগ্ধ, কমনীয়, প্রশান্ত, পবিত্র, সদ্ভাব ও সাধুতার আভাতে উজ্জল! দেখিলেই ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হয়; নাসাতে তিলক, বাহুদ্বয়ের উপরে ও বক্ষঃস্থলে হরিনামের ছাপ ও গলদেশে তুলসীর মালা; কণ্ঠসংলগ্ন একটী স্বর্ণনির্ম্মিত হুকে কুঁড়োজালিটী সর্ব্বদাই ঝুলিতেছে; তবে বস্ত্রাবৃত থাকে বলিয়া সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

কর্ত্তা বহুকাল হইল বিপত্নীক হইয়াছেন; পুত্রসন্তান নাই, কন্যা চতুষ্টয়ের মধ্যে দুইজন বিধবা হইয়া গৃহেই আছেন; তাঁহারাই পিতার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

তিনি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের ট্রেজরিতে কেরাণীগিরি করিতেন। তখন হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা জন্মে। তখন হইতেই বৈষ্ণব সেবাতে অনেক অর্থব্যয় করিতেন। তৎপরে বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া ধর্ম্ম-চিন্তাকেই সার করিয়াছেন। সেও প্রায় ২৫ বৎসর হইয়া গেল। এখন নিত্য ভাগবত পাঠ, সাধু সেবা ও বৈষ্ণব সেবাতেই সময় যাপন করেন। তদ্ভিন্ন যে বিস্তীর্ণ পরিবারটীর উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে, তাহাদের প্রতিজনের কল্যাণ-চিন্তাতেও অনেকটা সময় দিতে হয়। তাঁহার উদারতা ও অপক্ষপাতিতা গুণে তাঁহার প্রতি এ পরিবারের সকলের এমনি ভাব যে তিনি যাহা করেন, তাহাতে কেহ দ্বিরুক্তি করে না। এমন কি কোনও বাড়ীতে কোনও শিশু গুরুতর পীড়িত হইলে, তিনি যতক্ষণ গিয়া না দাঁড়ান ও অভয় দান না করেন, ততক্ষণ তাহার জননীর মনে আশ্বাস হয় না। এই একটা কাজ তাঁহাকে সর্ব্বদাই করিতে হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ নাই; দীর্ঘজীবনে পৈতৃক ও সোপার্জ্জিত অর্থের যে কিছু সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা হইতে কন্যাদ্বয়ের প্রতিপালনের মত অর্থ রাখিয়া, অবশিষ্ট অর্থ দেবসেবা ও সাধুসেবার জন্য রাখিয়াছেন।

একজন পাকা কীর্ত্তনিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন, তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের রচিত পদাবলীর গান বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ। কর্ত্তা সহরের এক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের ভবনে তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহাকে নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। যথাসময়ে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী হয় ত অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন। নবাগত গায়ক সেই প্রেমপূর্ণ পদাবলী এমন মধুর ভাবে গাইতে লাগিলেন, যে পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যায়। নয়ন-তারা ইহার পূর্ব্বে কখনও বৈষ্ণবদিগের কীর্ত্তন শ্রবণ করেন নাই; শুনিয়া তাঁহার মন আশ্চর্য্য রসে নিমগ্ন হইতে লাগিল; দর দর ধারে নেত্রে জলধারা বহিতে লাগিল।

কীর্ত্তনান্তে নয়ন-তারার সহিত কর্ত্তার বৈষ্ণব কবিগণের সম্বন্ধে ও অপরাপর বিষয়ে অনেক কথোপকথন হইল। কথা কহিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন। নাত্নী বলিয়া প্রাচীন ধরণে অনেক ঠাট্টা তামাসা করিলেন।

পরদিন প্রাতে তিনি যখন গঙ্গাস্নানান্তে আসিয়া নিজ পূজার ঘরে প্রবিষ্ট হইবার উপক্রম করিতেছেন, তখন নয়ন-তারা বাড়ীর বৃদ্ধা মহিলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি ওঁর ঘরে ঢুকে পূজো দেখ্‌তে পারি?"—ইহা শুনিয়া কর্ত্তার জ্যেষ্ঠা কন্যা হাসিয়া বলিলেন,—"বাবা! নয়ন-তারা তোমার পূজোর ঘরে ঢুকে পূজো দেখ্‌তে চাচ্চে।"

কর্ত্তা। (হাসিয়া) কি দেখ্‌বে? বুড়ো মানুষের পাগলামি দেখ্‌বে? আচ্ছা এস!

নয়ন-তারা ঘরটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, চারিদিকেই পূজার আয়োজন। একখানি শ্বেত প্রস্তরের চৌকির উপরে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপিত। তৎপার্শ্বে অপর একখানি ক্ষুদ্র চৌকিতে একটী নারায়ণ শিলা; সম্মুখে তাম্রকুণ্ড ও পুষ্প চন্দন। ধূপ দীপের গন্ধে ভুরভুর করিতেছে। কর্ত্তা নয়ন-তারাকে অঙ্গুলি দ্বারা বসিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজ পূজাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পূজান্তে নাম জপ ও তৎপরে কীর্ত্তন। সেই বৃদ্ধ যখন একাকী করতালি দিয়া মধুর কণ্ঠে গান করিতে করিতে, নাচিয়া, নাচিয়া সেই মূর্ত্তিগুলিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, তখন নয়ন-তারার মনে ভক্তি-মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। কীর্ত্তন শুনিয়া চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। এই ভাবে তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া যেন ধ্যানস্থ হইলেন। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া আছেন, হঠাৎ কর্ত্তা তাঁহার গলে একছড়া তুলসীর মালা পরাইয়া দিয়া, তাঁহার নাকে তিলক পরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি কেমন সুন্দর দেখাচ্চে।" নয়ন-তারা ভক্তি ভাবে পদধূলি লইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন।

কর্ত্তা। নাত্নি! তুমি বেশ করেছ বিবাহ কর নাই, তুমি শ্রীরাধিকার রূপ, কৃষ্ণই তোমার পতি।

এই বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। নয়ন-তারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইলেন। বাড়ীর মহিলারা কেহ কেহ জানালা দিয়া দেখিতেছিলেন, তাঁহারা নয়ন-তারাকে তদবস্থাতে বাহির হইতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,

"ওমা কি সুন্দর দেখাচ্চে! আর কেন, এইত বরমাল্য পেয়েছ, এইবার নিজের ঘরকন্না বুঝে নেও।" শুনিয়া তাঁহার বড় লজ্জা হইল। মালা খুলিতে ও নাকের তিলক মুছিতে গেলেন, মহিলারা বাধা দিয়া বলিলেন, "আহা থাক্, কর্ত্তা সাধ করে দিয়েছেন, মুছ না।"

আহারান্তে নয়ন-তারা চুঁচড়াতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু কর্ত্তা বলিলেন,—"নাত্নি! যদি এসেছ আজকের দিনটা থাক, সন্ধ্যার সময় ভাগবত পাঠ হবে শুন্‌বে; আর আমার এককালে গান বাজনার বাতিক ছিল, তুমি বেশ শেতার বাজাতে পার শুনেছি, আমাকে একটু বাজিয়ে শোনাবে।" ইহার উপরে মণিলালবাবু থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, সুতরাং আজ আর যাওয়া হইল না।

এদিকে নয়ন-তারা হরেন্দ্রকে দিবার জন্য টুনীর হাতে যে পত্র দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা টুনী হারাইয়া ফেলিয়াছে। তিনি পড়াইতে আসিয়া শুনিলেন, মণিলালবাবু আসিয়া নয়ন-তারাকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন। তিনি পরদিন আসিবেন। শুনিয়া কথাটা ভাল লাগিল না। ভাবিতে লাগিলেন —"গোবিনের বিরুদ্ধে এত বল্‌লাম, তাতে কর্ণপাত করাই হলো না, আবার তাদের বাড়ীতে একলা যাওয়া হলো, আমাকে সংবাদটাও দেওয়া হলো না; এটা বোধ হয় আমাকে দেখাবার জন্য, যে তিনি নিজের ইচ্ছা মত কাজ কর্‌তে আমার বিরাগের ভয় করেন না, আমার গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নন। কি তেজী মেয়ে! আশ্চর্য্য, এত কোমলতার ভিতরে এতটা তেজ থাকে! এমন প্রকৃতির অবাধ্যতাও মিষ্ট।"

পরক্ষণেই গোবিনের কথা মনে হইয়া এই চমৎকার-সমন্বিত শ্রদ্ধার ভাবটুকু উড়িয়া গেল। "গোবিনটার সঙ্গে উনি এত মেশেন, একেবারেই ইচ্ছা করি না। নিজের মন যেমন পবিত্র, সকলকেই তেমনি পবিত্র চক্ষে দেখেন; কিন্তু এইরূপ মেয়েরাই মানুষকে সহজে বিশ্বাস করে ও বিপদে পড়ে। আবার মনে হইল, মণিলালবাবু নিজে লইয়া গিয়াছেন, সেখানে তাঁর স্ত্রী মায়ের মত আছেন,—থাকলই বা গোবিন। আবার মনে হইল দূর হোক্ গোবিনের সঙ্গে এই মেশামিশিটা কি করে বন্ধ করা যায়।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেলেন ও রাত্রিটা এক প্রকার উদ্বেগে কাটাইলেন।

পরদিন কলেজে গিয়া যখন শুনিলেন নয়ন-তারা আসেন নাই, তখন মনের উদ্বেগ অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া গেল। আর কলিকাতায় না গিয়া থাকিতে পারিলেন না। স্কুল হইতে শেষ ঘণ্টায় বিদায় লইয়া কলিকাতায় গেলেন। বাড়ুয্যে পাড়া তাঁর সুপরিচিত স্থান। সেখানে একজন বন্ধুর সহিত দেখা করিবার ছল করিয়া মণিলালবাবুর এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে গমন করিলেন।

হরেন্দ্রের মনের ভাবটা আজ কিরূপ তাহা কি সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন? কেন যে তিনি কলিকাতায় গেলেন, তা নিজেই হয় ত জানেন না। নয়ন-তারার সহিত ত সাক্ষাৎ হইবে না, মণিলালবাবুর বাড়ীতে ত প্রবেশ করিবেন না, নয়ন-তারা কি করিতেছেন তাহাত কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবেন না, তবে কেন গেলেন? তাহা বলিলে কি হয়, একটা বিহঙ্গম যদি দেখে তাহার সঙ্গিনীটী চরিতে চরিতে একটা কালসর্পের গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সর্পটী পাশেই শুইয়া আছে, তখন তাহার কিরূপ ভাব হয়? সে চ্যাঁ চ্যাঁ করে, উপরে উড়িতে থাকে, এ ডালে ও ডালে বসিতে থাকে, সর্পটীকে ঠুকরাইবার চেষ্টা করিতে থাকে, ইহা কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন; হরেন্দ্রের যেন আজ সেই দশা উপস্থিত! তিনি চ্যাঁ চ্যাঁ করিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন। কিন্তু গিয়া লুকাইয়াই থাকিলেন। সেই প্রতিবেশীর বাড়ীতে মণিলালবাবুর বাড়ীর একটী বালকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। হরেন্দ্র যে নয়ন-তারার সহিত পরিচিত তাহা না জানিয়াই সে বালকটী সংবাদ দিল, যে কালী-পদ রায়ের বড় মেয়ে সেদিন প্রাতে কর্ত্তার পূজার ঘরে ঢুকিয়া তুলসীর মালা ও তিলক লইয়াছে। হরেন্দ্র শুনিয়া অগ্নি-প্রায় হইয়া চুঁচড়াতে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন নয়ন-তারা পিতৃব্যের ভবন হইয়া বিনোদকে সঙ্গে করিয়া চুঁচড়াতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই শুনিলেন ত্বরায় পিতার বায়ু-পরিবর্ত্তন করা স্থির হইয়াছে। তাঁহাকে বোটে বোটে নদীগর্ভে কিছুদিন রাখিতে হইবে। তৎপরে শান্তিপুর ও গুপ্তিপাড়ার মধ্যে গঙ্গার গর্ভে একটী চড়া আছে, ঐ চড়ার উপরে রায় মহাশয়ের একজন বন্ধুর একটী সুন্দর বাঙ্গলা আছে; সে স্থানের বায়ু অতি পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর, সেখানে কিছুদিন থাকিয়া দেখিতে হইবে, শরীর ভাল থাকে কি না, সেখানে উপকার না হইলে পশ্চিম যাওয়া হইবে। এইরূপ স্থির হইয়া সেই বন্ধুকে পত্র লেখা হইয়াছে। পিতার নিকটে

এই সংবাদ পাইয়া নয়ন-তারা তখনি মনে মনে যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কে কে সঙ্গে যাইবে, কে কে থাকিবে, চুঁচড়ার বাড়ীর কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই সকল ভাবিতে ভাবিতে নিজ মন্দিরে গেলেন। গিয়াই টুনীর মুখে শুনিলেন, যে সে তাঁহার প্রদত্ত পত্রখানি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহা শুনিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল। মনে মনে বলিলেন—"যেখানে বাঘের ভয় সেই খানেই সন্ধ্যা হয়, একে দারুণ অভিমানী মানুষ, তার উপরে এই দুর্ঘটনা! হয় ত দেখব অভিমান করে টং হয়ে আছেন। হয় ত ভাবছেন আমি গোবিনবাবুর জন্তেই গিয়েছিলাম। হা কপাল, গোবিনবাবু কি আর আমার বন্ধুতা চান, তিনি যে সন্থর পিছনে লেগেছেন তা জানেন না। তা আমি ভেঙ্গে বল্‌তে গেলাম কেন? যা ইচ্ছে হয় মনে করুন; আমার প্রতি বিশ্বাসটা গড়ে পিটে দাঁড়াক।" এই ভাবিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপরাহ্নে হরেন্দ্র টুনী পটলাকে পড়াইতে আসিলে চাকর পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। চাকর গিয়া বলিয়া আসিল—"আপনার পড়ান হলে উপরে যাবেন, দিদীমণি ডেকেছেন।"

অধ্যাপনান্তে হরেন্দ্র যখন উপরে আসিলেন, তখন তাঁহার মুখে মেঘের সঞ্চার দেখিয়াই নয়ন-তারার প্রাণ কাঁপিয়া গেল; একটা মহা ঝড় আসিতেছে।

নয়ন-তারা। বসুন, আমি আপনার জন্তে টুনীর কাছে একখানা পত্র রেখে গিয়েছিলাম, টুনী হারিয়ে ফেলেছে, আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য বোধ করে থাক্‌বেন যে আমি খপরটা না দিয়ে কি করে গেলাম।

হরেন্দ্র। আপনার উপরে আমার দাওয়া কি, যে কোথাও যেতে হলে আমাকে খবর দিয়ে যেতে হবে?

সেই গম্ভীর উত্তর শুনিয়া ও মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার হাসি পাইল, কিন্তু হাসিলেন না।

নয়ন-তারা। আপনি নিশ্চয় মনে করেছেন, গোবিন বাবুর বন্ধুতার টানে গিয়েছিলাম, না?

হরেন্দ্র। আমি কি মনে করেছি, তা আপনাকে বল্‌তে গেলাম কেন?

নয়ন-তারা। তাঁদের বাড়ীর কর্ত্তা আমাকে দেখ্‌তে চেয়েছিলেন, তাই মণি জেঠা এসে আমাকে এক প্রকার জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

হরেন্দ্র। আমি ত আপনার কৈফিয়ৎ চাচ্ছি না, ও সব কথা বল্‌বার প্রয়োজন কি?

এখান হইতে নয়ন-তারার মনেও বিরক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল।

নয়ন-তারা। আমার কাজের কৈফিয়ৎ আবার কাকে দিতে যাব। তবে একটা ভুল ধারণা থাকা উচিত নয় বলেই বলছি।

হরেন্দ্র। বৈষ্ণব বাড়ীতে গিয়ে বৈষ্ণব হওয়া হয়েছে! যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন, এরির নাম উদারতা।

নয়ন-তারা আর হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। হো হো করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

ওঃ সেই তিলক ও মালার কথা। সে খবর আপনাকে কে দিলে? আমি পূজোর ঘরে পূজো দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, বুড়ো মানুষ আমার গলায় মালাছড়া দিয়ে দিলেন, আমি কি করবো, দেখ্‌বেন মালাছড়াটা?

এই বলিয়া তুলসীর মালাগাছ আনিলেন।

হরেন্দ্র। (সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া) যান্ যান্ এসব আমি হাসি ঠাট্টার কথা মনে করি না।

নয়ন-তারার মন আবার বিরক্ত হইয়া উঠিল।

বাপ্‌রে বাপ্ গোড়ামিটা যে কি জিনিস, তাকে বাগানই ভার। বুড়ো মানুষ মালা ছড়াটা গলায় দিয়ে দিয়েছেন, তাতে হয়েছে কি? আমার শরীর কি অপবিত্র হয়ে গিয়েছে? না আমি বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছি? এর চেয়ে বৈষ্ণবেরা ত ভাল দেখ্‌ছি, তাঁরা আমাদের মতি গতি অন্য রকম জেনেও ত আমাদের প্রতি স্নেহ দেখাতে ক্রটী করেন না। ধর্ম্ম কি কেবল গোঁড়ামিতে থাকে? প্রেমে থাকে, উদারতাতে থাকে।

হরেন্দ্র। থাক্ থাক্ আপনার উদারতার লেক্‌চার ঢের শুনেছি।

এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নয়ন-তারা আর একটী কথাও বলিলেন না; বসিতেও অনুরোধ করিলেন না; রাগিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিলেন; হরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। চলিয়া গেলেই নয়ন-তারা উঠিয়া মালা ছড়াটী রাখিলেন; রাখিয়া কোচখানির উপরে অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"কি বেয়াড়া মানুষ! একটা দিকই দেখ্‌তে

পান, দুটা দিক আর দেখ্‌তে পারেন না। আর পায়ে তেল দিয়ে পারা যায় না। আমি আর ডাক্‌ব না, কথা না কইলে কথা কব না, দেখিনা কি করেন।” এই বলিয়া উঠিয়া গৃহকার্য্যে গমন করিলেন।

ইহার পর হরেন্দ্র দিনের পর দিন টুনী পটলাকে পড়াইতে আসিতে লাগিলেন, নয়ন-তারার সহিত আর দেখা করেন না, নয়ন-তারাও ডাকিয়া পাঠান না। বাড়ীর লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, “এদের দুজনের হলো কি?” কিন্তু কেহই জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দুই দিন পরেই পত্র আসিল যে রায় মহাশয় ইচ্ছা করিলে গুপ্তিপাড়ার চড়াস্থ বাঙ্গলাতে গিয়া কয়েক মাস থাকিতে পারেন। আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়, যদি যাইতে হয়ত শীঘ্রই যাওয়া কর্ত্তব্য। পত্র পাইয়াই ত্বরা বাড়িয়া গেল। কে কে সঙ্গে যাইবেন, কে কে এ বাড়ীতে থাকিবেন, পরিবার মধ্যে এই চর্চ্চা উপস্থিত হইল। নয়ন-তারাকে যাইতে হইবে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু তদ্ভিন্ন আর কে কে যাইবেন? জননীর ইচ্ছা তিনি যান, কিন্তু এ বাড়ীতে থাকে কে? নন্দরাণী ত নিজের সন্তানদিগকে লইয়াই ব্যস্ত। এত বড় সংসারটা কি একা সৌদামিনীর মাথার উপরে দিয়ে রাখা উচিত? একদিন নয়ন-তারা বলিলেন, “মা তুমি গেলে ত চল্‌বে না? হাজার হোক সদু ছেলে মানুষ, তাকেই তোমার দেখা দরকার, সে কি এত বড় সংসারটা সাম্‌লাতে পার্‌বে? আমি একা গেলেই বাবাকে দেখার বিষয়ে যথেষ্ট হবে, আমি বলি আমি রাঁধুনী, চাকর ও একজন কর্ম্মচারী নিয়ে একাই যাই। তুমি এখানেই থাক, আমি বাবাকে সারিয়ে আন্‌ছি।

জননী। তুই একা কি পেরে উঠবি? তবু আমি কাছে থাক্‌লে ওঁর মনটা অনেক ভাল থাক্‌বে।

নয়ন-তারা। একা পারব না কেন? কাজটা কি, একজন মানুষের তত্ত্বাবধান আর করতে পারব না?

কয়েক দিন এইরূপ নানা তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। একবার প্রস্তাব হইল সৌদামিনী যাইবেন, আবার সেটা রহিত হইল। কেহ বলিলেন পটলা সঙ্গে যাক, আবার সেটাও রহিত হইল। শেষে রায় মহাশয় নিজে স্থির করিয়া দিলেন, যে একেলা নয়ন-তারাই যাইবেন। তদনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল।

যাওয়া স্থির হওয়া অবধি নয়ন-তারার মনের বিশ্রাম নাই। কোথায় কি বন্দোবস্ত করিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন। হরেন্দ্র এখনও বাঁকিয়া আছেন, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ নাই। কিন্তু সে দুঃখটা মনে বড় দাঁড়াইতে পারিতেছে না; যাত্রার ত্বরাতে সেটাও যেন ভুলিয়া যাইতেছেন।

নানা কাজের মধ্যে তাঁহার একটী গুরুতর কাজ উপস্থিত হইয়াছে। মহেন্দ্রবাবু আসিয়া সংবাদ দিয়াছেন, যে আড়াই হাজার টাকা দেনার জন্য হরেন্দ্রের বাড়ী বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। তিনি কলিকাতাতে টাকা কর্জ্জ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কৃতকার্য্য হন নাই। সেজন্য ক্লেশে দিন যাপন করিতেছেন। এ সংবাদ মহেন্দ্রনাথ হরেন্দ্রের নিকট পান নাই; কলিকাতা হইতে জানিয়া আসিয়াছেন।

এই সংবাদ শোনা অবধি নয়ন-তারার মন এত ব্যস্ততার মধ্যেও গুরুতর চিন্তায় আক্রান্ত হইল। ইহার একটা উপায় না করিয়া গেলে, তিনি নিশ্চিন্ত মনে পিতার সেবা করিতে পারিবেন না। অথচ হরেন্দ্র যেরূপ বাঁকা লোক অন্য কাহারও দ্বারা সাহায্য করাইতে গেলে তিনি লইবেন না। এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া অবশেষে নিরুপায় হইয়া, পিতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা শ্রেয় বলিয়া মনে করিলেন। একদিন পিতার সহিত এ বিষয়ে কথা হইল।

নয়ন-তারা। বাবা! আমি গোপনে জান্‌লাম হরেনবাবু বড় বিপদে পড়েছেন।

রায় মহাশয়। কি বিপদ?

নয়ন-তারা। তাঁর বাবা কার কাছে তাঁদের বাড়ীটা বাঁধা দিয়ে দেড় হাজার টাকা নিয়েছিলেন; সেই দেড় হাজার টাকা নাকি সুদে আসলে আড়াই

হাজার টাকাতে দাঁড়য়েছে। সে ব্যক্তি এখন বাড়ীখানা বিক্রী করে নিতে চাচ্চে।

রায় মহাশয়। হরেন এ কথা আমাকে বলে নি কেন?

নয়ন-তারা। তিনি কি বল্‌বার লোক, জানত তাঁর প্রকৃতি কিরূপ, আমি তোমাকে এ কথা বলেছি শুন্‌লে একেবারে বেঁকে বস্‌বেন, আর আমাদের ধারে আস্‌বেন না।

রায় মহাশয়। আজ এলে তাকে ডেকে দিও, যা কর্‌বার আমি কর্‌বো।

নয়ন-তারা। না বাবা আমার ডেকে দেওয়াটা ভাল নয়, তুমি আর কারুকে দিয়ে ডেকে পাঠিও।

রায় মহাশয়। আচ্ছা আমাকে ত দেখ্‌তে আস্‌বে, তখন আমি যা কর্‌বার কর্‌বো।

সেই দিন অপরাহ্নে হরেন্দ্র রায় মহাশয়কে দেখিতে আসিলে, রায় মহাশয় অপর সকলকে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে বলিলেন। ঘরটী নিজ্জন করিয়া হরেন্দ্রকে বলিলেন,—"আমি শুন্‌লাম, তোমার বাপের দেনার জন্যে তোমাদের বাড়ী নাকি বিক্রী হয়ে যায়?

হরেন্দ্র নিঃস্তব্ধ ও মস্তক অবনত করিয়া উপবিষ্ট।

রায় মহাশয়। কথা বল্‌ছ না যে, কত দেনা?

হরেন্দ্র। সুদে আসলে আড়াই হাজারের কিছু বেশি দাঁড়য়েছে।

রায় মহাশয়। দেনাটা কার কাছে?

হরেন্দ্র। আলিপুর জজ আদালতের উকীল বিধুভূষণ রায়ের কাছে।

রায় মহাশয়। সে না তোমার বাপের সহাধ্যায়ী বন্ধু, দুজনে না হরিহর আত্মা ছিল? মানুষটা কি রকম!

হরেন্দ্র। আমি মাসে মাসে যথাসাধ্য দিচ্চি, তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন, একেবারে টাকাটা চান।

রায় মহাশয়। ছি ছি! এমন লোকের সঙ্গে টাকা কড়ির কারবার রাখতে নেই; আচ্ছা তুমি এক কর্ম্ম কর, আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে তাকে দিয়ে ফেল।

হরেন্দ্রের কাণ লাল হইয়া গেল ; চক্ষে জল আসিল ; অভিমানে আঘাত পড়িল ; উঠিয় [illegible] যাইতে ইচ্ছা হইল। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলে [illegible] ই এখন পীড়িত, এখন এসব কথা থাক, আপনি সেরে আসুন, পরে [illegible] নি বিক্রী করবেন ভয় দেখাচ্চেন, বোধ হয় থামিয়ে রাখা যাবে, আমিই [illegible] রা করতে পারব।

রায় মহাশয়। [illegible] ইয়া) আঃ কি জ্বালা, তুমি সোজা কথাটা বুঝছনা কেন, আমি কি তো[illegible]কে দান করতে চাচ্চি ? তুমি আড়াই হাজার টাকা বিনা সুদে আমার কাছে কর্জ্জ নেও, তার পর টুনী পটলাকে পড়াবার জন্যে যে মাসে ২৫৲ টাকা দি তা আর নিও না, তাহলে ক্রমে শোধ করে তুলতে পারবে। এটা কি তোমার মনঃপূত হয় না ?

হরেন্দ্র দেখিলেন পীড়িত মানুষ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন, তখন বিনীত ভাবে বলিলেন—"মশাই যা ভাল বিবেচনা করেন করবেন।" এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় দেখিলেন নয়ন-তারা বাহিরের বারাণ্ডাতে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছেন, যেন পিতার ঘরে আসিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই হরেন্দ্র মনে মনে বলিলেন,—"বুঝেছি এ তোমারই কাজ।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

নয়ন-তারা। (ত্বরায় পিতার নিকট আসিয়া) কি হলো বাবা ?

রায় মহাশয়। হবে কি, তুমি এখনি মহেন্দ্রকে ডেকে পাঠাও, একবার তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে দেখি হতভাগা লোকটা সুদ কিছু ছাড়ে কি না, বন্ধুতার স্থলে আবার সুদ কি, এরা কি কষাই না জিউ ! কালই টাকাটা ফেলে দিতে হবে।

নয়ন-তারা। হরেনবাবু টাকা নিতে চেয়েছেন ত ?

রায় মহাশয়। মুখটা গোঁজ করে চলে গেল ; বোধ হয় এটা মনঃপূত হলো না ; আমি বলেছি আমরা ত তোমায় দান করছি না, আমার কাছে বিনা সুদে ধার কর, না হয় টুনী পটলার পড়াবার দরুণ ২৫৲ টাকা করে আর নিও না, তাহলেই ত শোধ হবে।

নয়ন-তারা। এ ত বেশ কথা।

তখনি মহেন্দ্রবাবুকে ডাকান হইল। মহেন্দ্রবাবু আসিলে স্থির হইল, যে তিনি ভোরের গাড়ীতে কলিকাতায় গিয়া বিধুভূষণ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ

করিবেন, এবং তিনি সুদটা ছাড়িতে পারেন কি না জানিয়া আসিবেন। সেই দিন অপরাহ্নেই টাকাগুলি শোধ করা হইবে।

তদনুসারে পরদিন প্রাতে মহেন্দ্রবাবু কলিকাতায় ...ন করিলেন। বিধুভূষণ রায়ের সহিত তাঁহার অগ্রেই আলাপ পরিচয় ... তরাং সুদটা ছাড়িবার অনুরোধ করিতে বিশেষ লজ্জা পাইতে হই...

মহেন্দ্রনাথ। আপনি একেবারে টাকাটা প... দটা ছেড়ে দিতে পারেন না?

বিধুভূষণ। (হাসিয়া) আপনি বুঝতে পারলেন না, আমি যদি অন্য জায়গায় টাকাটা লাগাতাম শতকরা ১৮৲ টাকা নিতে পারতাম, অভাব পক্ষে ১২৲ টাকা ত কেউ ছাড়াতে পারত না, তার স্থলে শতকরা ৯৲ টাকা নিয়েছি এই ত ছেড়ে দেওয়া।

মহেন্দ্রনাথ। লোকে বল্‌বে কি, আপনারা চিরদিন দুজনে হরিহরাত্মা ছিলেন, আজ তার বিধবা ও পুত্রের কাছে জুলুম করে সুদ আদায় করছেন!

বিধুভূষণ। ও কথাত বলা সহজ, যাদের টাকা কামাতে হয় তারাই জানে। আচ্ছা আপনি সাধু মানুষ আপনার অনুরোধে শতকরা ৬ ছয় টাকা কর্‌লাম।

মহেন্দ্র। যথা লাভ।

এই কথা বলিয়া চুঁচড়াতে ফিরিলেন। রায় মহাশয় পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের বিবরণ শুনিয়া রাগে ফুলিতে লাগিলেন। সেই দিন বৈকালেই দুহাজার দুশ বার টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। হরেন্দ্র পরদিন সংবাদ পাইয়া চক্ষের জল ফেলিলেন।

ইহার পরে রায় মহাশয়ের যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। বন্দোবস্ত হইল যে, বোটের সঙ্গে একখানি বড় নৌকা থাকিবে, তাহাতে জিনিস পত্র, একজন কর্ম্মচারী, রাঁধুনী ও একজন চাকর থাকিবে, বোটে রায় মহাশয়েরা পিতাপুত্রীতে থাকিবেন। প্রথমে ২০।২৫ দিন বোটে বোটে বেড়ান হইবে, তৎপরে গুপ্তিপাড়ার চড়াস্থিত বাঙ্গলাতে গিয়া থাকা হইবে। তদনুরূপ জিনিসপত্র নৌকাতে বোঝাই করা হইতে লাগিল। নয়ন-তারা মনে মনে একটা পরামর্শ করিলেন, যে এই প্রবাসবাসকালে পিতার শুশ্রূষা করিয়া যে সময় পাইবেন, তাহা জ্ঞানোন্নতিতে নিয়োগ করিবেন। এরূপ সঙ্কল্প

করিয়া উদ্ভিদ-বিস্তার আলোচনার জন্য জ্যেষ্ঠের প্রদত্ত অণুবীক্ষণটী ও তদনুরূপ গ্রন্থাদি লইলেন; সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য কতকগুলি লইলেন; কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইলেন; এবং বৈষ্ণব কবিদিগের গ্রন্থাবলী যাহা পাইলেন সংগ্রহ করিলেন। এ নবানুরাগটী বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া জন্মিয়াছে। দেখিয়া সৌদামিনী বলিলেন, "দিদি! এত বৈ যে নিচ্চ পড়বে কখন?

নয়ন-তারা। (হাসিয়া) নিয়মে কাজ কর্‌তে জান্‌লে সব কাজের জন্যেই সময় পাওয়া যায়। দুপর বেলা বাবা যখন বিশ্রাম কর্‌বেন তখন বসে বসে কি কর্‌বো। দেখিস্ কত নূতন বিষয় শিখে আস্‌বো।

কয়েক দিনের মধ্যে আয়োজন শেষ হইয়া গেল। চুঁচড়ার ভদ্রলোকেরা আসিয়া রায় মহাশয়ের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। কলিকাতা হইতে এস, পি, রায় ও তারাপদ বাবু দুই দিন পূর্ব্বে আসিয়া দেখা করিয়া গেলেন। ক্রমে যাত্রার দিন উপস্থিত। তৎপূর্ব্ব দিন নয়ন-তারা টেঁপীকে তাহার মাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। বলিলেন, "লক্ষ্মী মেয়ে মায়ের কাছে গিয়ে দুষ্টুমি করো না; আমি এসে আবার তোমাকে আন্‌বো।"

সেই দিন তিনি একে একে জননী, নন্দরাণী ও সৌদামিনী প্রত্যেককে যাহা বলিবার বলিয়া বিদায় লইলেন। জননীকে বলিলেন, "দেখ মা, গোবিনবাবু ও সদুর প্রতি একটু চোক রাখ্‌বে। সদু খুব সেয়ানা মেয়ে তবু তোমারও একটু চোক রাখা উচিত। গোবিনবাবুর বিষয়ে সবত শুনেছ। তাঁরা আপনার লোক, তবু একটু দূরে দূরে রাখাই ভাল।" তৎপরে নন্দরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! তবে চল্‌লাম্, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর বাবা সেরে উঠুন; কিরূপ চিন্তিত অন্তরে যাচ্চি বুঝ্‌তেই পারছ; সদু ছেলে মানুষ ওকে চালয়ে নেবে; যখন যেমন দেখ আমাকে লিখবে; হরেনবাবুর সঙ্গে ত রোজ দেখা হবে, তাঁর খবর আমাকে দেবে; আমি বাড়ীটে যেমন করে চালাতাম্ তেমনি করে চালাবার চেষ্টা কর্‌বে। সন্ধ্যার পরে সৌদামিনীর গলা জড়াইয়া আপনার ঘরে লইয়া গেলেন, লইয়া গিয়া দুজনে কোচে বসিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

নয়ন-তারা। সহু! আমিত বাবাকে নিয়ে চল্‌লাম, তুমি ঘরে রৈলে, তুমি আমার কাজ কর্‌বে, সকলকে আদর যত্ন কর্‌বে, সকল দিক সাম্‌লে চল্‌বে।

সৌদামিনী। আমি আছি, বৌ-দিদি আছেন, দুজনে এক রকম করে চালয়ে দেব, তুমি ভেব না।

নয়ন-তারা। আর একটা কথা তোমাকে এখনি বলা দরকার। (একটু থামিয়া) গোবিনবাবুর বিষয়ে তুমি কি মনে কর ?

সৌদামিনীর কাণ লাল হইয়া গেল ; একটু সাম্‌লাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মনে করে এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ ?"

নয়ন-তারা। আমরা যতটা বুঝ্‌তে পেরেছি, তিনি তোমাকে একটু বিশেষ চক্ষে দেখ্‌ছেন। তুমি কি সে বিষয়ে কিছু বুঝেছ ?

সৌদামিনী। হাঁ, মনে ত হয়।

নয়ন-তারা। তুমি সে বিষয়ে কি ভাব ?

সৌদামিনী। ভাব্‌ব আর কি, পুরুষের অমন কত ভাব হয়, কত ভাব যায়, একটু দূরে দূরে রাখাই ভাল।

নয়ন-তারা। ঠিক আমার মনের কথাটা বলেছ। আমি বলি ভালবাসা জিনিসটা যদি খাঁটি হয়, তাহলে যাবার নয়; কালে ধরা পড়ে ; একটু দূরে দূরে রাখাই ভাল। বিশেষ গোবিনবাবুর এই ভাবটা বাড়তে দেওয়ার পক্ষে দুটো কথা আছে ; প্রথম ভাবতে হবে, যে তিনি একটা বৃহৎ পরিবারের একজন লোক, আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের যতই আত্মীয়তা থাক না কেন, আমাদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধটা ঘটে এটা তাঁরা কখনই পছন্দ কর্‌বেন না ; গোবিনবাবু যে তাঁদের অমতে কাজ কর্‌তে পার্‌বেন এমন মনে হয় না ; দ্বিতীয় কথা যতদূর জানা গেছে কিছু দিন পূর্ব্বেও তাঁর স্বভাব চরিত্র বড় খারাপ ছিল ; তবে কিছু দিন ভালই দেখা যাচ্চে। অধিক কি বল্‌বো তুমিত বোকা মেয়ে নও।

সৌদামিনী। ও সব কথার এখন দরকার কি ? আমি এত বড় হলাম আমি কি আপনাকে সাম্‌লে চল্‌তে জানি নি ? তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেক ; আমি এমন কোনও কাজ কর্‌বো না, যাতে পরে পস্তাতে হবে, বা লজ্জা পেতে হবে।

নয়ন-তারা। (ভগিনীর মুখে চুম্বন করিয়া) আমি জানি এসব বিষয়ে তুমি আমার চেয়েও বুঝে চল্‌তে জান। তবে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চল্‌লাম, যখন যেরূপ ঘট্‌বে আমাকে জানাবে।

যাত্রার দিন প্রাতঃকালে অবশিষ্ট জিনিস বোটে উঠিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তাঁহাদের আহারের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ, গৌরীপদবাবু প্রভৃতি চুঁচড়ার বন্ধুগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেন্দ্র আসিয়া জিনিস পত্র বহিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। নয়ন-তারার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ হইল, চক্ষে চক্ষে মিলন হইল, কিন্তু উভয়ের কেহই কথা কহিলেন না।

বেলা ৮টার সময় রায় মহাশয় নৌকাতে গিয়া বসিলেন। নয়ন-তারা জননীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; সুরেশচন্দ্রের নিকট বিদায় লইলেন, "দাদা সব রৈল দেখ।" টুনী, পটলা, টাইগার, টাইনী পর্য্যন্ত, সকলের নিকট বিদায় লইলেন। বোট ছাড়িল; রায় পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ একদৃষ্টে চাহিয়া কূলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বোট ছাড়িলেই অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে নয়ন-তারা বোটের জিনিস পত্র যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিয়া ও পিতার ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া পিতার নিকট বসিলেন।

তাঁহার প্রাণ আজ বিষাদে ডুবিয়া যাইতে লাগিল; কি দায়িত্ব মস্তকে লইয়া একাকিনী চলিলেন! বিদেশে পিতার পীড়া যদি বৃদ্ধি পায় কি করিবেন? তাঁহার অনুপস্থিতিতে বাড়ীর অবস্থা কি দাঁড়াইবে? এই সকল চিন্তা তাঁহার মনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তৎপরে হরেন্দ্রের কথা মনে হইতে লাগিল। "আসিবার সময়েও তাঁর সঙ্গে কথাটা কহিলাম না, হয় ত আরও বিরক্ত হ'লেন। দশজনের কাছে বিদায় নিলাম, তাঁর কাছেও বিদায়টা নেওয়া উচিত ছিল; তা হলো না, সেটা ভাল হলো না।" আবার ভাবিলেন,—"মেয়ে মানুষের এত হাল্‌কা হওয়া কি ভাল, তিনি যদি রাগ করে থাকৃতে পারেন, আমি কি আর রাগ করে থাক্‌তে জানি নি; যাক্‌ বৌএর চিঠীতে তাঁর খবর ত পাব। দেনাটা যে শোধ হয়েছে, এটা একটা সুখের বিষয়; সেজন্যে বোধ হয় আমার উপরে আর একটু বিরক্তি বেড়েছে, তা কি কর্‌বো, দেনাটা রেখে এলে সুস্থির থাক্‌তে পার্‌তাম না।"

তাঁহার মন দিয়া যে এত চিন্তা গেল, রায় মহাশয় তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনের চিন্তা মনে রাখিয়া প্রসন্ন বদনে পিতার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতে হইতে কথোপকথনটা ধর্ম্ম বিষয়ে আসিয়া পড়িল।

নয়ন-তারা। আমরা যেভাবে দিন কাটাই এটা ভাল বোধ হয় না, ধর্ম্ম কর্ম্মের নাম গন্ধ নাই, কেবল খাও দাও আর আমোদ আহ্লাদ কর।

রায় মহাশয়। কথাটা কি জান, একটা ভেঙ্গে আর একটা গড়া বড় কঠিন। সে কালের লোকের একটা রকম ছিল, আমরা সেটা হারিয়েছি, অথচ নূতন একটা দাঁড় করাতে পার্‌ছি না।

নয়ন-তারা। আমি ত তোমাকে বার বার বলি, আমার এ কালের লোকদের চেয়ে যেন সে কালের লোকদের ভাল লাগে; তাঁদের নিষ্ঠা ভক্তি দেখে আমার মন মুগ্ধ হয়।

রায় মহাশয়। সাধারণ লোকের ধর্ম্ম-শিক্ষার যে উপায়গুলো ছিল, একে একে চলে যাচ্ছে, সেগুলোকে রাখা যাচ্ছে না, অথচ নূতন কোনও প্রণালী প্রবর্ত্তিত হচ্চে না, ভয় হচ্চে কালে এমন ধর্ম্ম-প্রিয় জাতটা ধর্ম্মহীন হয়ে যাবে।

নয়ন-তারা। আচ্ছা, আমরা যতটুকু বুঝেছি, ততটুকু কর্‌বার চেষ্টা করা ত ভাল। আমরা আর কিছু না জানি, এটা ত জানি যে, ঈশ্বর আমাদের উপাস্য, আমরা ত তাঁর উপাসনাকে আমাদের পরিবারের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে করে রাখতে পারি; তাতে আমাদের ধর্ম্ম চিন্তার অভ্যাস হয়; পরিবারে শৃঙ্খলা ও ধর্ম্মশাসনটা থাকে; আর ছেলেদের ধর্ম্মশিক্ষারও সাহায্য হয়।

রায় মহাশয়। তাত বুঝ্‌লাম, কিন্তু এ কাজটা করে কে?

নয়ন-তারা। কেন তুমি কর্‌বে, তুমি আমাদের সকলকে একত্র করে বসাবে, আমরা সকলেই গাইতে জানি, সকলে ঈশ্বরের স্তুতি গান কর্‌বো, তার পর তুমি কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিছু পড়ে শোনাবে ও নিজে ঈশ্বর-চরণে সকলের জন্যে প্রার্থনা কর্‌বে, এটা ত রোজ হতে পারে। এখন ত আমরা নাস্তিকের মত থাকি, এটা হলেও ত বোঝা যায় যে, আমাদের একজন উপরওয়ালা আছেন।

রায় মহাশয়। জানই ত, ধর্ম্ম বিষয়ে আপনার সন্তানদেরও কিছু বল্‌তে লজ্জা করে, আমার যে ওটা আসে না।

নয়ন-তারা। অনভ্যাস বলে আসে না; না হয় কোনও ছাপা বৈ থেকে এক একটা স্তুতি পড়া যেতে পারে।

সেদিন বৈকালবেলা রায় মহাশয় কতকগুলি পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত স্তুতির সহিত কতকগুলি নূতন রচিত স্তুতিসংযোজিত করিয়া একটী স্তুতি প্রস্তুত করিলেন।

স্থির হইল, যে প্রতিদিন প্রাতে মুখ হাত ধুইয়া সর্ব্বাগ্রে কিয়ৎকাল ঈশ্বরের শ্রবণ মননে যাপন করা হইবে, নয়ন-তারা একটী সঙ্গীত করিলে, কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ করা হইবে, তৎপরে রায় মহাশয় সংস্কৃত স্তুতিটী পাঠ করিবেন ও নয়ন-তারা তাহার বাঙ্গালা অনুবাদটী পড়িবেন ও তৎপরে আবার সঙ্গীত হইয়া স্তুতি সমাধা হইবে। এতদ্ব্যতীত স্নানান্তে প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় উপাসনা কার্য্য সমাধা করিবেন, ও বৈকালে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হইবে।

বোটে থাকিবার সময় প্রতিদিন এই নিয়মে কাজ চলিল। এতদ্ব্যতীত নয়ন-তারা পিতাকে আরও অনেক বিষয় পড়িয়া পড়িয়া শুনাইতেন। দিনটা বড় সুখেই যাইতে লাগিল। রায় মহাশয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতিও দেখা যাইতে লাগিল। পিতাপুত্রীতে চন্দ্রালোকে বোটের ছাতে বসিয়া পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ে অনেক আলাপ হইত। এরূপ নির্জ্জনে, এরূপ নিরুদ্বেগে এ সকল কথা কখনও হয় নাই। ধর্ম্মভাবের বিনিময়ে উভয়ের হৃদয় দিন দিন ভাবে গভীর হইতে লাগিল। নয়ন-তারা যখন বৈষ্ণব ভক্তগণের জীবন ও উক্তি সকল পড়িয়া শুনাইতেন, তখন দুই জনেরই চক্ষে জলধারা বহিত।

এইরূপে প্রায় এক মাস কাল তাঁহারা বোটে বোটে বেড়াইলেন। এক এক স্থানে ধরেন, ডাকের চিঠিপত্র গ্রহণ করেন, জিনিস পত্র ক্রয় করেন, দুই তিন দিন থাকেন, আবার চলিয়া যান। এইরূপে নানাস্থানে বেড়াইয়া এক মাস পরে গুপ্তিপাড়ার চড়াতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বাঙ্গলাটীর চতুষ্পার্শ্বে বিস্তীর্ণ প্রান্তর; চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে; অযত্নসম্ভূত বৃক্ষরাজি দ্বীপটীকে মনোরম করিয়া রাখিয়াছে; গঙ্গার সন্নিকটবর্ত্তী বালুকা-রাশির উপরে কৃষকগণ ক্ষেত করিয়াছে; নানা শস্যের ক্ষেতগুলি হরিদ্বর্ণ হইয়া রহিয়াছে; বাঙ্গলার সন্নিকটে চারিধারে ফুলের বাগান; একজন মালী আছে

সে তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। নয়ন-তারার পদার্পণে বাগানটী নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রত্যেক বৃক্ষটী যেন অনুভব করিল, একজন যত্ন করিবার লোক সে গৃহে আসিয়াছেন। সকলের শ্রী ফিরিয়া গেল।

এখানেও নয়ন-তারাকে একটী ক্ষুদ্র সংসার পাতিয়া বসিতে হইল। প্রতিদিন নদীর পার হইতে যথাসময়ে দুগ্ধ আনয়ন করা কঠিন, অথচ প্রাতেই পিতার তাজা দুগ্ধের প্রয়োজন। এ জন্য এখানে আসিয়াই দুইটী দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিলেন। তাহাদের জন্য একটী চলনসই গোয়ালঘরও নির্ম্মিত হইল। সে দুইটীর তত্ত্বাবধান করাও তাঁহার একটা কাজের মধ্যে দাঁড়াইল।

নূতন স্থানে আসিয়াও তাঁহাদের অবলম্বিত ধর্ম্মসাধন প্রণালী অক্ষুণ্ণ রহিল; বরং সে বিষয়ে উভয়ের আগ্রহ ও মনোযোগ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দিবা শেষে পিতাপুত্রীতে উদ্যান মধ্যে বসিয়া কেবল এই সকল বিষয়ে কথা হইত। কোথা দিয়া সময় যাইত তাহা বুঝিতেও পারিতেন না।

এখানে আসার পর নয়ন-তারা নিয়মমত বাড়ীর সকলের পত্র পাইতে লাগিলেন। কেবল সৌদামিনী দুই চারিখানি পত্র লিখিয়া মৌনী হইলেন। নয়ন-তারা অনুমানে বুঝিলেন, যে গোবিন নেশাতে তাঁহাকে ধরিতেছে, পত্র লিখিবার অবসর নাই। আর একজন মৌনী রহিলেন, তিনি হরেন্দ্র। দিনের পর দিন নয়ন-তারা মনে করিতে লাগিলেন, কোন দিন তাঁহার পত্র আসিবে; কিন্তু হরেন্দ্রের সাড়া শব্দ নাই। তিনিও অভিমান করিয়া পত্র লিখিতে বিরত থাকিলেন। যাহা হউক, সে জন্য হরেন্দ্রের সংবাদ পাওয়ার ব্যাঘাত হইল না। নন্দরাণী প্রত্যেক পত্রে তাঁহার সংবাদ দিতে লাগিলেন।

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় রায় মহাশয় যখন আহারান্তে বিশ্রাম করিতেন, তখন নয়ন-তারা পাঠে মনোনিবেশ করিতেন। রাখাল বালকদিগকে পয়সা দিয়া প্রতিদিন প্রাতে নানাপ্রকার লতা পাতা সংগ্রহ করিতেন, দ্বিপ্রহরে অনুবীক্ষণের সাহায্যে তাহাদের পরীক্ষা করিতেন ও উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের বর্ণনার সহিত মিলাইতেন; তদ্ভিন্ন পূর্ব্বাধীত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া পুরাতন বিদ্যাকে মার্জ্জিত করিতেন। এতদ্ব্যতীত বৃদ্ধ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া ও কীর্ত্তন শুনিয়া বৈষ্ণব কবিদিগের প্রতি যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহাও এখানে জাগ্রত রাখিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্য অনেক

পড়িয়া ফেলিলেন। কেবল তাহা নহে, নিয়মে কাজ করার এমনি গুণ, প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক ৩।৪ ঘণ্টা পড়িয়া পড়িয়া প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ অবগত হইবার নিমিত্ত বাঙ্গালায় অনুবাদিত সমগ্র মহাভারত গ্রন্থখানি প্রায় আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিলেন। এইরূপে নূতন স্থানে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে চুঁচড়ার বাড়ীতে গোবিনের ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় সপ্তাহে দুই দিন আসিতেছেন। ক্রমে এই বিষয় লইয়া দুই বিভিন্ন দলের লোকের মধ্যে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম, দল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের মহিলাগণ। গোবিনের বাড়ীতে তাঁহার বিধবা ছোট পিসী থাকেন। তিনি গোবিনকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন; সুতরাং ঐ যুবকের প্রতি তাঁহার মাতৃ-স্নেহ বলিলে হয়। গোবিনের উচ্ছৃঙ্খলতার আতিশয্য বশতঃ সকলেই যখন নিরাশ হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এমন কি তাঁহার নিজের জননীও যখন তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেন না, তখনও ঐ স্নেহশীলা পিতৃষ্বসা গোবিনকে ছাড়েন নাই; তাহার পায়ে পায়ে থাকিতেন, কাঁদিতেন, অনুনয় বিনয় করিতেন, দেবতা ব্রাহ্মণের কাছে মাথা খুঁড়িতেন, "হে ঠাকুর! গোবিনের সুমতি হউক।" এরূপ কাঁদিবার একজন লোক থাকা এ সংসারে বড়ই সৌভাগ্য। এই পিতৃষ্বসার প্রার্থনার ফলেই বোধ হয় পত্নী-বিয়োগের দিন হইতে গোবিন একটু সামলাইয়াছেন; পুরাতন সঙ্গ যদিও একেবারে ত্যাগ করেন নাই, তথাপি সে সব দলে সর্ব্বদা যাতায়াতটা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাড়ীর মহিলারা বলাবলি করিয়া থাকেন, "সেই ত কুসঙ্গ ত্যাগ করলে তবে কেন ভদ্রলোকের মেয়েকে মনের কষ্ট দিয়ে মেরে ফেললে?"

সেই পিতৃষ্বসা এখন দেখিলেন গোবিনের এক রোগ ঘুচিয়া আর এক রোগে ধরিল, চুঁচড়াতে নিত্য গতায়াত আরম্ভ হইল। তিনি গোবিনকে

এ বিষয়ে হঠাৎ কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। এক প্রকার দুশ্চিন্তার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন মণিলালবাবুর সহিত তাঁহার এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল।

পিসী। তুমি খপরটা নেও দেখি গোবিন চুঁচড়াতে রোজ রোজ এত যাওয়া আসা আরম্ভ করেছে কেন?

মণিলাল। তা আর খপর নেব কি, সুরেশের সমবয়সী, গাওনা বাজনা, আমোদ আহ্লাদে তাদের সঙ্গে খুব মিশে গেছে।

পিসী। আমার ত বোধ হয় ভিতরে আর কিছু কথা আছে।

মণিলাল। ভিতরের কথা আবার কি?

পিসী। নয়ন-তারার মেজ বোনটীর বয়স কত?

মণিলাল। ১৯।২০ হবে।

পিসী। এর গোড়ায় সেই আছে।

মণিলাল। ছি ছি! এমন কথা বলো না, তারা অতি ভাল লোক, সে বাড়ীর ছেলে পিলে অন্য বাড়ীর মত নয়।

পিসী। তুমি খারাপটাই মনে করছ কেন, গোবিনের স্বভাব চরিত্র যে বদলে গিয়েছে তা কি আমরা দেখছি না? সে গোবিন আর নাই; এদের সঙ্গে মিশে সে যেন আর এক গোবিন হয়ে গিয়েছে। আমি কিছু খারাপ মনে করে বল্‌ছি না। সেখানে ভালবাসার টানে পড়েছে। একটা পাকাপাকি বেঁধে গেলে শেষে টেনে ছাড়াতে পার্‌বে না।

মণিলাল। (হাসিয়া) আচ্ছা, আমি একদিন চুঁচড়াতে যাব, গিয়ে কালীপদর স্ত্রীর কাছে জেনে আসব।

মণিলালবাবু চুঁচড়ায় গিয়া জানিয়া আসিলেন, যে পিতৃস্বসা যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহাই সত্য। তখন পরিবার মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। রায়-গৃহিণী মণিলালবাবুকে বলিয়াছেন, "গোবিনকে ত আমরা পরের মত ব্যবহার কর্‌তে পারি না; সে বাড়ীতে আস্‌বে অথচ আমরা আদর যত্ন কর্‌বো না, বা বাড়ীর ছেলেরা তার সঙ্গে মিশ্‌বে না, তা হতেই পারে না। আমরা কি করে বাড়ীতে আস্‌তে বারণ কর্‌বো? সেটা ত ভদ্রতার নিয়ম নয়। আপনারা ইচ্ছে কর্‌লে বারণ করে দিতে পারেন।" সুতরাং ছোট পিসী

অবশেষে মুখ ফুটিয়া গোবিনকে বলিতে লাগিলেন, "তোর চুঁচড়াতে এত যাতায়াত কেন?"

গোবিন। তোমার তা কি?

ছোট পিসী। তাদের বাপ বাড়ীতে নেই, তাদের ঘরে বড় বড় মেয়ে আছে, এত যাতায়াত করা কি ভাল? লোকে বল্‌বে কি? আর তারা পছন্দও করে না যে তুই এত ঘন ঘন যাতায়াত করিস্।

গোবিন। তুমি কি করে জান্‌লে?

ছোট পিসী। না জান্‌লে বল্‌ছি। তাঁরা চক্ষু লজ্জায় বল্‌তে পারেন না, ভদ্রলোকের ছেলেকে কি করে বারণ কর্‌বেন।

গোবিন। এ কথাতে আমার বিশ্বাস হচ্চে না; আমি জানি তাঁরা আমাকে ভালবাসেন।

ছোট পিসী। তুই নিজের চোকে মানুষকে দেখিস বৈত নয়, আমাদের সঙ্গে তাঁদের যে সম্বন্ধ, তাতে তোকে তাঁরা কি করে আপনার মত ব্যবহার না কর্‌বেন, তোর কিন্তু এত যাতায়াত করা ভাল নয়।

গোবিন। আচ্ছা, তাঁরা যদি না চান যে আমি যাই, তাহলে আমি যাব না।

এই কথোপকথনের পর গোবিন স্থরেশচন্দ্রকে সমুদয় কথা ভাঙ্গিয়া পত্র লিখিলেন, এবং তিনি যে সৌদামিনীকে ভালবাসেন ও তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়া, তাঁহার জীবনে কিরূপে এক নূতন অধ্যায় খুলিয়াছে, তাহাও গোপন রাখিলেন না। সর্ব্বশেষে ইহাও জানাইলেন, যে যদি সৌদামিনীর আপত্তি না থাকে, এবং তাঁহারা বিরোধী না হন, তাহা হইলে তিনি সৌদামিনীর সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছেন।

মানুষ কাজ করে এক ভাবিয়া, হইয়া দাঁড়ায় আর এক প্রকার। ছোট পিসীর প্রতিবন্ধকতাতে ব্যাপারটা ঘনীভূত হইয়া দাঁড়াইল। বাধা পাইয়া গোবিনের প্রেম উছলিয়া চলিল। যথাসময়ে স্থরেশের উত্তর আসিল। তাহার মর্ম্ম এই,—তুমি আসাতে আমরা সকলে আনন্দিত হই; তুমি যেরূপে আপনার পুরাতন রীতি নীতি সংশোধন করিয়াছ, তাহা শুনিয়া আমরা সকলেই বিশেষ প্রীত ও তোমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছি; আমার ভগিনীর ভাব আমাদের

অপেক্ষা তুমি বোধ হয় অধিক জান, সে বিষয়ে অধিক কি বলিব? তবে পরিণয় সম্বন্ধের বিষয়ে শেষ কথা পিতা মহাশয়কে না জানাইয়া বলিতে পারি না।"

পত্র পাইয়া গোবিন ছোট পিসীকে বলিলেন, "তোমরা আমাকে মিছে কথা বলেছ, আমার যাওয়ার বিষয়ে তাঁদের অমত নাই, বরং তাঁরা তাতে আনন্দিত।"

ছোট পিসী। তুই কথাটা ভেঙ্গে বল্‌না কেন, তাঁদের মেজ মেয়েটীকে বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছিস কি না?

গোবিন। আমি বিয়ে কর্‌তে চাইলেই কি হবে? তিনি কি আমার মত মানুষকে বিয়ে কর্‌তে চাবেন? আমি তাঁদের কাছে দাঁড়াবার উপযুক্ত নয়।

ছোট পিসী। ও বাবা এতদূর গড়য়েছে! তবে আর বাকি কি! তারপর বুড়ো মার কর্‌বি কি? তুই যে ওঁর অন্ধের নড়ি, এমন কাজ কর্‌লে কি আর আমাদের সঙ্গে থাকৃতে পার্‌বি?

গোবিন। তা আর কি, ছেলে কি চিরদিন মায়ের আঁচলে বাঁধা থাকে, আমি আজ ঘরে না থেকে যদি দূরে থাকৃতাম, তাহলে কি হতো?

ছোট পিসী। ইস্ তুই যে মনে মনে সব ঠিক করে নিয়েছিস দেখছি, তবে আর ঝগড়া করে ফল কি, কপাল পুড়েছে দেখছি।

গোবিন। ঠিক ঠাক্ কিছুই করিনি, যদি হয়ই তাই ভেবে বল্‌ছি।

ইহার পরে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে মহা দুশ্চিন্তা বাড়িয়া গেল। রায় পরিবারের সহিত মণিলালবাবুর যতই আত্মীয়তা থাক্ না কেন, তাঁহাদের সঙ্গে যে একটা বিবাহ সম্বন্ধ হয় ইহাতে তিনি প্রস্তুত নহেন। তিনি একবার সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে, একবার তারাপদ রায় মহাশয়ের সঙ্গে, সাক্ষাৎ করিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, "সৌদামিনীকে বলিয়া নিবৃত্ত কর, সে যেন গোবিনকে প্রশ্রয় না দেয়।" তারাপদবাবু একদিন বিনোদকে পাঠাইয়া সৌদামিনীকে আনাইলেন; নিজের পত্নীর দ্বারা তাহার মনের সকল কথা জানিবার চেষ্টা করিলেন; নিজেও নির্জ্জনে তাহার সহিত অনেক কথা কহিলেন; কহিয়া এইমাত্র বুঝিলেন যে, তাঁহারা বিরোধী হইলে সৌদামিনী

চিরদিন অবিবাহিত থাকিবেন, কিন্তু গোবিন ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। এই কথা জানা অবধি তারাপদবাবু বুঝিলেন যে গোবিনের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিতেই হইবে। তৎপরে তিনি গোবিনকে ডাকাইয়া অনেক কথা কহিলেন; তাহার স্বভাব চরিত্রের বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিলেন; সকলের মুখেই শুনিলেন সে গোবিন আর নাই, বদলিয়া গিয়াছে। তাহাতে তাঁহার ইচ্ছাটা আরও দৃঢ় হইল। তিনি মণিলালবাবুকে বলিলেন,—"আপনারা বাধা দিবেন না; গোবিন ত আর কচি ছেলে নয়, থাকলইবা বাহিরে বাড়ী করে, আপনাদেরই ত থাকবে।"

এই বিষয় লইয়া কলিকাতার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইহাঁরা কোনও কথা হঠাৎ কর্ত্তার কর্ণগোচর করেন না; তাঁহার অজ্ঞাতসারে অনেক কাজই হইয়া যায়; ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়টা আর তাঁহার গোচর না করিয়া থাকা যাইতেছে না। অবশেষে গোবিনের ভাব পরিবর্ত্তনের বিষয় তাঁহাকেও শোনান হইল। তিনি ধীর ভাবে সমুদয় শুনিয়া একদিন সন্ধ্যার পর নিজের শয়ন-গৃহে গোবিনকে ডাকিলেন। দুইজনে গোপনে কি কথা হইল, তাহা কেহই জানে না। পরদিন তিনি মণিলাল বাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"গোবিনের স্বভাব চরিত্র চিরদিন যে রকম তাতে সে যদি একটী মেয়েকে ভালবেসে বিবাহ করে, তার কল্যাণই হবে, অতএব এ বিবাহে বাধা দিও না। কত ছেলে ত পৈতৃক ভিটে ছেড়ে বাহিরে বাড়ী করেছে, সে না হয় তাই করবে। সে বলেছে যে, পৈতৃক ভিটেতে তার যে অংশ আছে, তা তার মায়ের ও পিসীর জন্যে ও তাঁদের দেহান্ত হ'লে ভাইপোদের জন্যে লিখে দিয়ে যাবে। তাই লিখিয়ে নেও; সে নিজে উপার্জ্জন করে যে টাকা করেছে, তাই দিয়ে বাড়ী কিনে নিক; নিয়ে বিবাহ করে গৃহ-ধর্ম্ম করুক। এ বিয়েতে বাধা দিলে সে আবার খানে খারাপ হয়ে যাবে; সে কাজ করো না।"

বিবাহে কর্ত্তার সম্মতি জানিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে মহিলাগণের আর্ত্তনাদ উঠিল। বৃদ্ধা জননী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা একদিন তাঁহাকে বুঝাইলেন,—"তুমি কাঁদ কেন, গোবিনের স্বভাব চরিত্র শুধরে গিয়েছে সে জন্যে কেন আনন্দ কর না? ছেলে ত কোথাও যাচ্ছে না; সঙ্গে নিয়ে খাওয়া

দাওয়াটা নাই বা হলো; কৃষ্ণ যদি এমন কর্লেন, তবে আর শোক করে কর্‌বে কি?"

কেবল যে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে গোলযোগ পড়িয়া গেল, তাহা নহে, আর এক দলেও গোবিনের পরিবর্ত্তনে গোলযোগ পড়িয়া গেল। তাহা রঙ্গভূমি সকলের অভিনেতা ও অভিনেত্রী মহলে। গোবিন দুই বৎসর হইতে তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা কম যাতায়াত করিতেন বটে, কিন্তু একেবারে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। সাহায্যের আবশ্যক হইলেই গিয়া সাহায্য করিতেন; তাহাদের মধ্যে একটা আমোদ প্রমোদ ঘটনা হইলে, তাহাতে অংশী হইতেন। কিন্তু সৌদামিনীকে জানা অবধি সে যাতায়াতও বন্ধ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের সহিত মেশাটা এত হীন কাজ মনে হইয়াছে, যে তাহার স্মরণেও লজ্জা হয়। সুতরাং বহুদিন হইল, তিনি তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করিয়াছেন। তাহাদের ঘোর মুস্কিল বাঁধিয়াছে। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত তাহাদের সঙ্গীত বিভাগটা চলে না। অবশেষে রঙ্গভূমির ম্যানেজার হরিশচন্দ্র ঘোষ একদিন গোবিনের নিকট উপস্থিত। ইনিও একজন কলিকাতার বনিয়াদী ভদ্রঘরের সন্তান। কিন্তু এমনি কালের মহিমা যে ইনিও সহরের সমুদায় ভদ্রলোকের ও নিজের আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে বাজারের প্রকাশ্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কোমর দুলাইয়া নাচিতে লজ্জিত হন না। ইনি গোবিনের একজন বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ইনি আসিয়া গোবিনকে একটা রিহার্শালে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া বসিলেন,—"তোমাকে যেতেই হবে, নতুবা চল্‌ছে না; তুমি আমাদের ছাড়্‌লে হবে না।"

গোবিন। মাপ কর ভাই, আমার দ্বারা ও সব কাজ আর হবে না, দুষ্কর্ম্মটা ঢের দিন করেছি আর নয়।

হরিশ। সে কিহে তোমার যে ভারি ধর্ম্মজ্ঞান হলো দেখ্‌ছি। ব্যাপারটা কি বল দেখি।

গোবিন। ঈশ্বর করুন তোমারও মন আমার মত হয়; আমরা নিজে পাপে ডুবেছি, দেশটাকেও ডুবয়েছি।

হরিশ। তাই ত তুমি যে অনেক দূর গিয়েছ দেখছি।

গোবিন। আমি কি তোমার সঙ্গে তামাসা কর্‌ছি? আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, এ সকল পথ ত্যাগ কর্‌বো। জান ত আমি কিরূপ দুর্ব্বল মানুষ, আমাকে আর প্রলোভনে ফেল না। তোমাদের কাজ তোমরা চালাওগে, তোমাদের বন্ধুদের লিষ্ট হ'তে আমার নাম কেটে দেওগে।

হরিশ। (গম্ভীরভাবে) এর উপরে আর কথা নেই, যে ভাল হতে চায়, তাকে যে পাপে ফেলে, তার মত পাপী আর জগতে নাই। আমার আর কথা নাই।

গোবিন। আমি খুসী হলাম।

হরিশ। তা যেন হলো, সহরে একটা গুজব শুন্‌ছি, সেটা কি সত্যি।

গোবিন। কি গুজব?

হরিশ। তুমি নাকি আবার বিয়ে কর্‌তে যাচ্চ?

গোবিন। বিয়ে কর্‌তে যাচ্চি যে তা ঠিক নয়, কর্‌লেও কর্‌তে পারি।

হরিশ। মানুষটা কে তা কি শুন্‌তে পারি।

গোবিন। সেটা এখন নাই বা শুন্‌লে।

হরিশ। (হাসিয়া) কাক মুখে আমরা শুনেছি; চুঁচড়ার কালীপদ রায়ের মেজ মেয়ে—না?

গোবিন। কোথায় শুন্‌লে?

হরিশ। সে কথায় কাজ কি, সত্যি কি না বল না।

গোবিন। হাঁ, সত্য।

হরিশ। (হাসিয়া) যা হোক জালে খুব কাত্‌লা ফেলেছ ত।

গোবিন। অমন হাল্‌কাভাবে কথা কইলে আমি কথা কব না। কতকগুলো বাজারের মেয়ের সঙ্গে মেশ বৈ ত নয়, এই উঁচু দরের মেয়েরা যে কি জিনিস তা ত জান না, সে মেয়ে যদি দেখ্‌তে তা হলে পায়ে পড়ে পূজো কর্‌তে।

হরিশ। (হাসিয়া) আমাদের ভাগ্যে ত সেটা ঘট্‌বে না, আমাদের হ'য়ে তুমিই করো।

গোবিন। ঠাট্টা করে যাই বল না কেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর যেন আমি পাপের পথ ছেড়ে পুণ্যের পথে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারি।

হরিশ। (গম্ভীর ভাবে) আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি।